KALIKATA LITTLE MAGAZINE LIBRARY-O-GABESHANA KENDRA
18/M TAMER LANE, KOLKATA-700009

Record No.: KLMLGK 2007	Place of Publication: ৫৪ গণেশচন্দ্র অ্যাভিনিউ, কল-১৩
Collection: KLMLGK	Publisher: নীর রহমান
Title: চতুরঙ্গ	Size: 7" x 9.5" 17.78 x 24.13 c.m.
Vol. & Number: ৪৭/১ ৪৭/২ ৪৭/৩ ৪৭/৪ ৪৭/৫	Year of Publication: May 1986 Jun 1986 July 1986 Sep 1986 Oct 1986
	Condition: Brittle / Good ✓
Editor: আবদুর রউফ	Remarks:

C. D. Roll No.: KLMLGK

হুমায়ুন কবির এবং আতাউর রহমান প্রতিষ্ঠিত

চতুরঙ্গ

১৯৮৬ • মে

শিবনারায়ণ রায় তাঁর স্বভাবসুলভ ভঙ্গিতে উপস্থাপন করেছেন ভারতের সাহিত্য-সংস্কৃতির ধারাবাহিকতা প্রসঙ্গে একটি ব্যতিক্রমধর্মী বিশ্লেষণ।

চৈতন্যদেবের আবির্ভাবের পাঁচশো বছর পূর্তি উপলক্ষে বাংলাদেশের প্রবীণ চিন্তাবিদ্ আহমদ শরীফের প্রতিবেদন : 'চৈতন্যদেবের ভাব-বিপ্লব, তার তাৎপর্য ও পরিণাম'।

কবি শামসুর রাহমান তাঁর বিরলদৃষ্ট গদ্য-রচনায় সন্ধান করেছেন তাঁরই চেতনায় রবীন্দ্রনাথের স্থান।

গ্রন্থ-সমালোচনা বিভাগে রবীন্দ্র-বিষয়ক গ্রন্থের আলোচনায় পান্নালাল দাশগুপ্ত, অমলকুমার মুখোপাধ্যায় প্রমুখ। এবং অন্যান্য নিয়মিত বিভাগ।

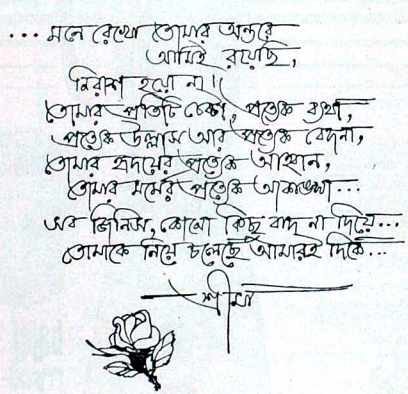

বর্ষ ৪৭। সংখ্যা ১
মে ১৯৮৬
বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ ১৩৯৩

ভারতীয় সংস্কৃতি ও সাহিত্যে ধারাবাহিকতা প্রসঙ্গে শিবনারায়ণ রায় ১
চৈতন্যদেবের ভাববিপ্লব : তার তাৎপর্য ও পরিণাম আহমদ শরীফ ১৬
আমার চৈতন্যে রবীন্দ্রনাথ শামসুর রাহমান ৩৩

সৈকত শঙ্খ ঘোষ ১২
এই রাত, এই নদী বিশ্বজিত চৌধুরী ১৩
জীবনচরিত জয়কৃষ্ণ কয়াল ১৪
স্বদেশ মনিরুজ্জামান ১৫

অলীক মানুষ সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ ২২
পটভূমি নির্মলকুমার দাস ৩৯

গ্রন্থসমালোচনা ৪৭
অমলকুমার মুখোপাধ্যায়, প্রণতি মুখোপাধ্যায়, পান্নালাল দাশগুপ্ত

আলোচনা ৫৪
ভবানীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, নিখিলকুমার নন্দী, অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়

মতামত ৬৪
বিমলভূষণ চট্টোপাধ্যায়, দেবাশিস ঘোষ

শিল্পপরিকল্পনা। রনেনআয়ন দত্ত
নির্বাহী সম্পাদক। আবদুর রউফ

কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি
ও
গবেষণা কেন্দ্র
১৮/এম, ট্যামার লেন, কলকাতা-৭০০০০৯

শ্রীমতী নীরা রহমান কর্তৃক নবজীবন প্রেস, ৬৬ গ্রে স্ট্রীট, কলিকাতা-৬ থেকে
অন্তরঙ্গ প্রকাশনী প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে মুদ্রিত ও ৫৪ গণেশচন্দ্র অ্যাভিনিউ,
কলিকাতা-১৩ থেকে প্রকাশিত ও সম্পাদিত। ফোন : ২৭-৬৩২৭

Premier Sprinkler Systems
A Total Tea Irrigation Plan

The Premier 'total-tea-Irrigation-plan' means the best irrigation system with specialized equipment engineered at the lowest capital cost for your garden.

Sprinklers
Spray water gently and evenly. Exclusive sealed bearings to ensure years of continuous reliable operation.

Coupling Valves
New and exclusive to Premier Systems. Sprinklers are moved and reconnected easily and quickly. Less labour. More irrigation.

Pipelines
Flexible and strong. Fastest coupling and uncoupling. Best water sealing.

Pumpsets
More reliable. More economical.

Soil Moisture Meter
Helps you control irrigation. Maximize production with minimum water.

Premier Service
Highly trained expert team who survey and analyse before proposing the Premier Sprinkler System best suited to your garden. Backed by prompt and comprehensive after-sales-service.

Prernier Irrigation—not just a complete system, a complete service.

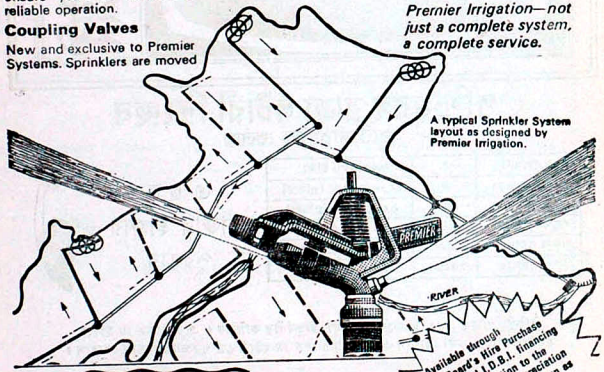

A typical Sprinkler System layout as designed by Premier Irrigation.

Available through Tea Board's Hire Purchase Scheme and I.D.B.I. financing facilities in addition to the normal annual I.T. depreciation. a 25% deduction as investment allowance is permitted in the year of installation.

PI PREMIER IRRIGATION EQUIPMENT LIMITED

Plantation Irrigation Department
17/1C, Alipore Road, Calcutta 700 027
Tel : 45-7455/7626/5302

ভারতীয় সংস্কৃতি ও সাহিত্যে ধারাবাহিকতা প্রসঙ্গে

শিবনারায়ণ রায়

যে প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগপর্বে তার প্রথম অধিবেশনের সভাপতি হয়েছিলেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিভিন্ন সময়ে যে প্রতিষ্ঠানকে অলংকৃত করেছেন প্রফুল্লচন্দ্র রায়, মেঘনাদ সাহা আর সত্যেন্দ্রনাথ বসুর মতো বৈজ্ঞানিক, রমেশচন্দ্র মজুমদার আর নীহাররঞ্জন রায়ের মতো ঐতিহাসিক, রবিশঙ্করের মতো সুরকার, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতো ভাষাশাস্ত্রী এবং শরৎচন্দ্র থেকে তারাশঙ্কর আর মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রেমেন্দ্র মিত্র আর অন্নদাশঙ্কর রায়ের মতো সাহিত্যিক, সেই নিখিল ভারত বঙ্গসাহিত্য সম্মেলন যে আমার মতো বিতর্কিত চিন্তক এবং যন্ত্রজনপঠিত সাহিত্যসেবীকে এ বছরের অনুষ্ঠানে মূল সভাপতিরূপে নির্বাচিত করেছেন তাতে আমি যুগপৎ বিস্মিত ও বিব্রত বোধ করছি। বিস্মিত, কারণ এই সম্মেলনে আমি আগে কখনো আসি নি, এর আহ্বায়ক আর সংগঠকদের সঙ্গে আমার পরিচয় নেই বললেই চলে, এবং আমি দীর্ঘকাল ধরে সাহিত্যচর্চা করছি বটে কিন্তু সাহিত্যসম্মেলন প্রভৃতিতে যাঁরা সচরাচর আসেন এবং এই বিশেষ সম্মেলনে যাঁরা এসেছেন তাঁদের ভিতরে অধিকাংশই শুধু আমার লেখার সঙ্গে নয় আমার নামের সঙ্গেও হয়তো-বা অপরিচিত। বিব্রত এই কারণে যে আমার চিন্তা এবং প্রকাশরীতি জনপ্রিয় নয়, আমি যা ভাবি ঠিক সে কথাই বলার এবং লেখার চেষ্টা করি, শ্রোতা অথবা পাঠককে আদৌ তুষ্ট করবার চেষ্টা কখনও করি নি এবং করবার অভিলাষ রাখি নি। এখানে যাঁরা সমবেত হয়েছেন হয়তো তাঁদের অনেকের সঙ্গেই আমার ভাবনার মিল হবে না, এবং সেক্ষেত্রে আমার পারকাব্যোধ তীব্রতর না হলেও নিমন্ত্রণকর্তারা হয়তো কিঞ্চিৎ আশাহত হবেন।

তবে যে বিবেচনা থেকেই হোক নিমন্ত্রণ যখন করেছেন এবং ব্রাত্যজনের উপস্থিতি কতটা সংগত তার ঠিক হিসেব না করেই সে নিমন্ত্রণ যখন আমি গ্রহণ করেছি, তখন দুপক্ষকেই আপন দায়িত্ব পালন করতে হবে। অর্থাৎ আমি যতটা সংক্ষেপে আর স্পষ্টভাবে পারি আমার কিছু প্রাসঙ্গিক চিন্তা আপনাদের কাছে পেশ করব, এবং আমি আশা করব আপনারা ধৈর্য আর অভিনিবেশের সঙ্গে সেটি শুনবেন এবং যতদূর সাধ্য খোলা মনে সেটি বিবেচনা করবেন।

(নিখিল ভারত বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনে মূল সভাপতির ভাষণ, পণ্ডিচেরি ৪ঠা ফেব্রুয়ারি, ১৯৮৮)

যেহেতু আপনাদের ভিতরে অনেকেই লেখক, আপনারা ভোগস্বত্বভাবে আমার কথাটি শুধু শুনবেন এমন আশঙ্কা করি না। আমার বক্তব্যে বেশ কিছু ত্রুটি থাকবে, এটা সুনিশ্চিত, কিছু আপনাদের না-পসন্দ্ কথাও থাকবে। আপনাদের মধ্যে কেউ-কেউ কোথাও না কোথাও লিখে সে ত্রুটি পরে দেখিয়ে দেবেন, না-পসন্দ্ প্রকাশ করবেন এটি আমি স্বভাবতই প্রত্যাশা করব।

এই সম্মেলনের কেন্দ্রীয় আলোচ্য বিষয় "ভারতীয় সংস্কৃতি ও সাহিত্যে ধারাবাহিকতা"। অন্তত নিমন্ত্রণ-কর্তারা সে কথাই আমাকে জানিয়েছেন। সুতরাং এখানে আমার বক্তব্য এই বিষয়টিতেই আবদ্ধ রাখব এবং আশা করব বিভিন্ন শাখার অধিবেশনে বিভিন্ন প্রসঙ্গে এটিই নানা দিক থেকে আলোচিত হবে।

এক

ধারাবাহিকতা বলতে কী বুঝি? বিশেষ করে সাংস্কৃতিক এবং সাহিত্যিক ধারাবাহিকতা। পূর্ববর্তী ঘটনার পিছনে পরবর্তী ঘটনার বিবরণমাত্র দিলে তাকে কেউ ধারাবাহিক ভাবে না। শুধু সময়ক্রমে ঘটনারাজির পূর্বপরতা যেমন যথেষ্ট নয়, কোনো ঘটনার বার-বার স্রেফ পুনরাবৃত্তিকেও তেমনি ধারাবাহিক বলা যায় না। ধরা যাক একই বাড়িতে এক রাতে থিয়েটার হয়েছে, তার পরের রাতে বিয়েবাড়ির ভোজ, তার পরের সন্ধ্যায় রাজনৈতিক সভা, তার পর বোমার বিস্ফোরণে বাড়িটি ভেঙেচুরে গেছে, পরে বাড়িটাকে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দিয়ে সেখানে পথ নির্মিত হয়েছে। এ সবই পর-পর ঘটনা একই জায়গায় ঘটছে। কিন্তু এদের ভিতরে প্রত্যক্ষ অথবা নিহিত কোনো যোগসূত্র আছে বলে জানা নেই। ধারাবাহিক বলতে আমরা নিশ্চয় এই ধরনের যোগসূত্রহীন ঘটনাক্রম বুঝি না। ধারাবাহিকতার কল্পনার মধ্যে এক ধরনের ঐক্যের নির্দেশ নিহিত থাকে—কার্যকারণের, বা উদ্দেশ্যের, বা সংযুতির, বা অনুবন্ধের অনবচ্ছেদ একতা। আবার যদি একটি কাগজের উপরে একটি রবার স্ট্যাম্পের ছাপ বার-বার মারা হয় তাহলে সেই ক্রিয়াকলাপকেও কেউ ধারাবাহিক আখ্যা দেয় না। ধারাবাহিক হবার জন্য যেমন ঘটনার ক্রম এবং সংযুতির একতা তেমনি পরিবর্তন আর বৈচিত্র্যের উপস্থিতিও জরুরি। অর্থাৎ ধারাবাহিক বলতে সেই ধরনের ঘটনার অনুক্রম বোঝানো হয় যার ভিতরে ঐক্য এবং ব্যতিক্রম দুইই প্রত্যক্ষ, অন্তত যুক্তির সাহায্যে অনুমেয়।

এখন এক হিসেবে সব দেশ এবং দেশবাসীর ইতিহাসই ধারাবাহিক। প্রকৃতি-পরিবেশ প্রতি দেশকে একটি বিশেষ ঐক্যের দ্বারা চিহ্নিত করে এবং সেখানকার নদী, পাহাড়, অরণ্যপ্রান্তর সচরাচর খুব ধীর গতিতেই বদলায়। বহু সহস্র বৎসর পূর্বে মহাসমুদ্রের ভিতর থেকে প্রচণ্ড চাপে হিমালয় পর্বতমালার উদ্ভব ঘটেছিল, আর সেই পর্বতমালা থেকে প্রবাহিত হয়েছিল গঙ্গানদী। যদিও আমরা জানি সংসারে কিছুই সত্য নয়, একদিন হিমালয়ও থাকবে না, গঙ্গাও থাকবে না, বস্তুত মনুষ্যপ্রজাতি, পৃথিবী, এমন-কি এই নিয়মনিয়ন্ত্রিত মহিমায় সৌরজগৎ পর্যন্ত একদিন অনিবার্যভাবেই বিলুপ্ত হবে, তা হলেও মানবীয় ইতিহাসের মাপকাঠিতে হিমালয় আর গঙ্গা, এবং যে বিরাট উপ-মহাদেশের তারা প্রহরী আর পালক, যাকে এক সময়ে ভারতবর্ষ বা হিন্দুস্থান বলে চিহ্নিত করা হত, তাদেরকে একরকম নিত্য বলেই ধরা হয়ে থাকে, এবং এই ধরা মোটেই অসংগত নয়। বস্তুত প্রকৃতি-পরিবেশের প্রায় সম্পূর্ণভাবে অনপেক্ষ, অনাবৃত, অনন্তরিত উপস্থিতি সেখানকার অধিবাসীদের চারিত্রিক ঐক্যের এবং আকরণিক ধারাবাহিকতার একটি প্রধান সূত্র। এ ক্ষেত্রে ভারতবর্ষের আলাদা কোনো বিশেষ দাবি গ্রাহ্য নয়। ভূগোলহীন ইতিহাস অকল্পনীয়, এবং সব দেশেরই ঘটনা-পরম্পরা সেখানকার স্থানিক বৈশিষ্ট্যসমাবেশের দ্বারা ধৃত এবং অনেকটাই নির্দেশিত।

অপরপক্ষে ব্যক্তিক, পারিবারিক ও সামূহিক ধারাবাহিকতার প্রধান এবং অবিসংবাদিত সূত্র বংশগতি। কোনো ব্যক্তি বা পরিবার নিঃসন্তান অবস্থায় বিলুপ্ত হতে পারে, কিন্তু কোনো বড়ো সমূহ বা প্রজাতি কচিৎ একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়। অবশ্য প্রকৃতি-পরিবেশে প্রচণ্ড কোনো পরিবর্তন বা বিস্ফোরণ ঘটলে সামূহিক বিলোপ অসম্ভব নয়। তবে সাধারণত দেখা যায়, যেখানে একবার কোনো জীবগোষ্ঠীর বসবাস শুরু হয়েছে সেখানে জননের ভিতর দিয়ে প্রজন্ম থেকে প্রজন্ম তা প্রবাহিত হয়, বহিরাগত নানা গোষ্ঠী বা গণ তার সঙ্গে মেশে—উপযোজন বা অভিযোজন এই ব্যাপারে সহায়তা করে। কিন্তু এই ধারাবাহিকতা প্রাণিমাত্রের ক্ষেত্রেই বিদ্যমান, বিশেষ করে মনুষ্যপ্রজাতি অথবা উক্ত প্রজাতির ভিতরে বিশেষ করে ভারতবাসী সম্পর্কে বংশগতিনির্ভর ধারাবাহিকতার আলাদা কোনো তাৎপর্য নেই। অন্য প্রাণী এবং দেশবাসীদের মতোই আমরাও প্রজন্মানুক্রমে টিকে থাকার জন্য প্রকৃতি এবং বংশগতির উপরে নির্ভরশীল। তা নিয়ে অহংকার বা হীনম্মন্যতা অর্থহীন।

আসলে, আমরা যখন ধারাবাহিকতার কথা বলি, তখন ভূগোল বা শারীরবৃত্তের কথা ভাবি না। আমরা সমাজ-সংস্কৃতির অনুষঙ্গেই ব্যাপারটিকে বোঝবার এবং বিচার করবার চেষ্টা করি। মানুষ একমাত্র জীব যে সংস্কৃতির স্রষ্টা এবং সংস্কৃতি যার নির্ণায়ক। অন্য প্রাণীর মতোই জননকোষ নিয়ে মানুষ প্রকৃতির ভিতরে জন্মায়, কিন্তু বংশবৃদ্ধি করা ছাড়াও মানুষ নিজের ভিতরে আর বাইরে পৃথক একটি জগৎও রচনা করে। প্রাগৈতিহাসিক যুগেই মানুষের এই বিশেষ শক্তির প্রকাশ দেখা যায় একদিকে যেমন খুব আদিম প্রযুক্তির উদ্ভাবনায়, অন্যদিকে তেমনি গুহাচিত্রের বিস্ময়কর কল্পনাপ্রাচুর্যে আর নিপুণতায়। পাখি এবং বাবুই বাসা বানাতে পারে, কিন্তু ছবি শুধু মানুষই আঁকে। ব্যাপক অর্থে মানুষের প্রযত্নে যা-কিছু নির্মিত হয় তাই কালচার বা সংস্কৃতি—চাষবাস থেকে শুরু করে আইনকানুন, দর্শনবিজ্ঞান, নাচগান, ছবি-কবিতা সবই এই অর্থে সংস্কৃতির অন্তর্গত। কিন্তু নৃতাত্ত্বিকদের বাদ দিলে যে প্রয়োগ অনেক বেশি সাধারণ-স্বীকৃত সংস্কৃতির সেই ব্যক্তার্থ সমাজ ও সভ্যতার বিশেষ-বিশেষ দিকের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। সমাজ থেকেই সংস্কৃতির উদ্ভব এবং সংস্কৃতি সমাজব্যবস্থার অন্যতম প্রধান ধারক বটে, কিন্তু সমাজ এবং সভ্যতার পরিব্যাপ্ত অস্তিত্বের অংশ হিসেবে সংস্কৃতির স্বাতন্ত্র্যও লক্ষণীয়। 'চলন্তিকা'-র আভিধানিক ভাষায় সংস্কৃতি হল "শিক্ষা বা চর্চার দ্বারা লব্ধ বিদ্যা বুদ্ধি শিল্প কলা রুচি নীতি ইত্যাদির উৎকর্ষ"। এই জাতার্থের দুটি বিশেষ উল্লেখ লক্ষণীয়: 'শিক্ষা বা চর্চার দ্বারা লব্ধ' এবং 'উৎকর্ষ'। একটু পরে এদের তাৎপর্য নিয়ে কিছুটা আলোচনা করব।

প্রকৃতি-পরিবেশ এবং বংশগতি ছাড়াও একটি ভৌগোলিক অঞ্চলের অধিবাসীদের জীবনযাত্রার ঐক্য এবং ধারাবাহিকতা দেয় তাদের রচিত সংস্কৃতি। সংস্কৃতির সবচাইতে মুখ্য উপাদান এবং ধারক হল ভাষা—এটিই মানুষের সর্বোত্তম উদ্ভাবনা। ছবি, নাচগান, উৎসব-অনুষ্ঠান সবকিছুর ভিতরেই মানুষের অন্তর্লোক ব্যক্ত হয় বটে, কিন্তু ভাষার মাধ্যমে মানুষের জ্ঞান ধৃত, সঞ্চিত এবং স্থানকালপাত্রের ব্যবধানকে অতিক্রম করে প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে সঞ্চারিত হয়। ভাষা ছাড়া মানুষের বিকাশ অকল্পনীয়—পূর্বপুরুষের অভিজ্ঞতা, সিদ্ধান্ত, আকল্প, প্রত্যয়, ব্যর্থতা সুদূরবর্তী উত্তরপুরুষের কাছে পৌঁছয় মুখ্যত ভাষার মাধ্যমে এবং ভাষা সময়ের ওপরে এই সেতুবন্ধ রচনা করতে পারে বলে মানুষের প্রাতিস্বিক এবং সামূহিক জীবনে পরিব্যক্তি বা মিউটেশন ছাড়াই বিবর্তন ও প্রগতি সম্ভবপর। জীবজন্তুতে প্রাজাতিক আত্মরক্ষা সহজপ্রবৃত্তি বা ইনস্টিংক্ট-নির্ভর এবং সহজ-প্রবৃত্তির প্রবণতা পুনরাবৃত্তির দিকে। মানুষের জীবনেও সহজপ্রবৃত্তির ভূমিকা অপ্রবল নয়, কিন্তু মানুষ বুদ্ধি, বিচার, বিবেচনা, বিশ্লেষণ, বিকল্পগ্রাম থেকে নির্বাচন, কল্পনা ও উদ্ভাবন ইত্যাদি সামর্থ্যেরও অধিকারী। ভাষা ছাড়া এইসব সামর্থ্যের বিকাশ সম্ভবপর নয়। ভাষা সমাজে ঐক্য আনে, সামূহিক জীবনে সাংস্কৃতিক ধারাবাহিকতা আর বিবর্তন সাধ্যায়ত্ত করে, এবং সবচাইতে বড়ো কথা, ভাষা মানবীয় জ্ঞানের উপায় এবং

আধার। মনুষ্যেতর প্রাণী নিজের চেষ্টায় সচেতনভাবে আপনাকে অথবা তার প্রজাতিকে বিকশিত বা রূপান্তরিত করতে অক্ষম: পুনরাবৃত্তি ছাড়া তার উপায় নেই। মানুষ নির্ভরযোগ্য জ্ঞানের সাহায্যে নিজের চেষ্টায় এবং অপরের সহযোগিতায় নিজেকে এবং তার সমাজকে বদলাতে আর বিকশিত করতে পারে। তাই গুহাবাসী, অরণ্যবাসী যাযাবর মানবগোষ্ঠী ক্রমে রূপান্তরিত হয় সভ্য গ্রাম- ও নগরবাসী মানুষে। এ কীর্তি একান্তভাবে মানুষের; মানুষকে বাদ দিলে প্রকৃতি, উদ্ভিদ্‌জগৎ বা প্রাণিজগতের কোনো সাংস্কৃতিক ইতিহাস নেই।

প্রাজাতিকভাবে বিশিষ্ট ধরনের গুরুমস্তিষ্ক নিয়ে জন্মেছে বলেই মানুষের পক্ষে জ্ঞানার্জন এবং ভাষা-উদ্ভাবন ও ভাষা-শিক্ষা সম্ভব। কিন্তু জন্মসূত্রে মানুষ শুধু সামর্থ্যটুকুই পায়, সেই সামর্থ্যের বাস্তবায়ন আর বিকাশ শিক্ষা এবং চর্চার উপরে নির্ভর করে। জন্মমাত্র কোনো শিশুকে যদি মনুষ্যসমাজ থেকে বিযুক্ত করে অন্য প্রাণীদের মধ্যে রাখা যায় তাহলে তার ভিতরে আপনা থেকেই কিছু আর মানবীয় ভাষাপ্রয়োগের শক্তি প্রকটিত হয় না, অন্য প্রাণীদের মতো তারও প্রকাশ এবং ভাব-বিনিময় অল্প কয়েকটি ভঙ্গি আর ধ্বনির মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে। মানুষকে ভাষা এবং জ্ঞান শিক্ষা এবং চর্চার দ্বারা অর্জন করতে হয়। সংস্কৃতির একটি বিশিষ্ট দিক হল যে তার উপাদান শিক্ষা বা চর্চার দ্বারা লভ্য। এ শিক্ষা যে শুধু পাঠশালা বা বিশ্ববিদ্যালয় বা গ্রন্থাগার থেকেই অর্জিত হয় তা তো নয়। শিশুর প্রাথমিক শিক্ষা ঘটে পরিবার, আত্মীয়স্বজন, প্রতিবেশীদের কাছে। কানে শুনে এবং অনুকরণ করে সে প্রথম ভাষা শেখে; তার পরও অনেক দিন ধরে প্রধানত অপর ব্যক্তিদের মুখ থেকে শুনেই সে তার সাংস্কৃতিক উত্তরলব্ধির কিছুটা শরিক হয়। মানুষের সাংস্কৃতিক উত্তরলব্ধি আজ বিরাট, বিচিত্র, জটিল, সুদূর দেশকাল বিস্তৃত। তার একটা বড়ো অংশকে নিজের চেতনার আয়ত্তে আনতে হলে, সেই জ্ঞানকে নিজের সমকালীন অভিজ্ঞতার বিচারে প্রয়োগ করতে হলে, তাকে আরো সমৃদ্ধ এবং নির্ভরযোগ্য করবার শক্তি অর্জন করতে হলে বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং বিশেষজ্ঞদের কাছে দীর্ঘকাল অশিথিল একাগ্রতায় শিক্ষা নিতে হয়। তাতেই যা লব্ধ তাতে উৎকর্ষ আসে। সংস্কৃতির বিকাশ ঘটে।

এইখানে একটু থেমে ধারাবাহিকতা প্রসঙ্গে সংস্কৃতি, শিক্ষা, উৎকর্ষ এবং সাহিত্যের সম্পর্ক নিয়ে অতি সংক্ষেপে হলেও কিছু বিবেচনার প্রয়োজন আছে। ইতিহাসপূর্ব আদিম মানুষের পক্ষে উৎকর্ষের সম্ভাবনা ছিল খুবই সীমাবদ্ধ; কিন্তু শ্রমবিভাজিত সমাজে আমরা কিছু মানুষকে গোড়া থেকেই দেখি উৎকর্ষ অর্জন যাদের জীবনের মুখ্য অভীষ্ট এবং সমাজ যাদের এই ভূমিকাকে স্বীকৃতি এবং সম্মান দিয়ে এসেছে। অক্ষর-উদ্ভাবনের পর থেকে এই পার্থক্য স্পষ্টতর হয়। অক্ষরিত ভাষায় যেমন জ্ঞানের সংরক্ষণ ও সম্পোষণের সম্ভাবনা প্রচুর বেড়ে যায়, তেমনি অক্ষরিত ভাষা এবং সেই ভাষায় ধৃত জ্ঞান ও কল্পনাকে আয়ত্তে আনবার জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে সবিশেষ অধ্যবসায় আর শক্তি, এবং প্রাণধারণের প্রয়োজনে কায়িক শ্রমের দায়িত্ব থেকে মুক্তি। এই শক্তি আর আগ্রহ সকলের থাকে না, এবং এতাবৎ কোনো সমাজেই একাগ্রভাবে জ্ঞানচর্চার সুযোগ-সুবিধা অধিকাংশ স্ত্রী-পুরুষ পায় নি। ব্যক্তির দ্বারা ভাষা এবং জ্ঞানের অনন্যমন চর্চা যেমন সমাজের সম্পদ বাড়ায় তেমনি সমাজের মধ্যে এক ধরনের প্রায় অলঙ্ঘ্য বিভেদ এবং ব্যবধানও গড়ে তোলে। ভাষা এবং ভাষাধৃত জ্ঞানের উৎকর্ষসাধন মনীষী, চিন্তক, ভাবুক, ভাষাশিল্পীদের কাজ। এই কাজ যাঁরা করেন এবং সেই কাজের ফল সম্যকভাবে ভোগ করবার সুযোগ এবং শিক্ষা যাঁরা পান তাঁদের সঙ্গে নিরক্ষর বা স্বল্পশিক্ষিত জনের পার্থক্য ক্রমেই বেড়ে চলে। মার্কস এবং তাঁর গোঁড়া অনুগামীরা এই ভেদ আর দ্বন্দ্বকে তাঁদের ইতিহাসতত্ত্বে অবহেলা করেছেন। শ্রেণীদ্বন্দ্বের চেহারা ও দিগ্‌দর্শন নিয়ে বিতর্ক হয়েছে এবং হচ্ছে, তবে ইতিহাস এবং সমাজশাস্ত্র নিয়ে যাঁরা পড়াশুনো করছেন তাঁরা সম্ভবত সকলেই স্বীকার করবেন যে সভ্যতার সূচনা থেকেই সব সমাজে যাঁরা ভাষা এবং জ্ঞানের একাগ্র সাধক সাধারণ মানুষ থেকে তাঁদের একটি স্বতন্ত্র ও উচ্চতর স্থান নির্দিষ্ট হয়ে এসেছে। গায়ের জোর, জমিদারি, অস্ত্রসাধিত্র, অর্থবল, ব্যবসা-বাণিজ্য—এসবের সঙ্গে তাঁদের জীবিকার যোগ থাকতে পারে, কিন্তু সমাজে তাঁদের প্রভাবপ্রতিপত্তি এবং বিশেষ সম্মানের উৎস এগুলি নয়, তার উৎস তাঁদের নিরলস অনুশীলনপুষ্ট মনীষা। জ্ঞানী, প্রাজ্ঞ, ঋষি, বিদ্বান, গুরু, আচার্য সব সমাজেই সাধারণ মানুষ থেকে আমাদের এবং সাধারণ মানুষের শ্রদ্ধাভাজন। বিভিন্ন ভাষাতে এঁদের সম্মানার্হ বলে চিহ্নিত করা হয়েছে মেজাই, ম্যাজিস্টার, মাএস্ত্রো, মাজ্‌ডা, লেহ্‌রার, উসিটেল, সাপিএন্‌স্‌, সাবিও ওয়াইজ, বুজুর্গ, উলেমা ইত্যাদি নামে। এঁদের বংশধররা মনীষাহীন বা অনুশীলননিবৃত্ত হয়েও পিতৃপুরুষের দৌলতে সুযোগসুবিধে পেয়েছেন, কিংবা শক্তিমান এবং বিত্তবানদের পৃষ্ঠপোষণের কারণে পণ্ডিত ব্যক্তিরা ওই পৃষ্ঠপোষকদের গুণকীর্তন করেছেন—এ তথ্য কারো অবিদিত নয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও যা অনস্বীকার্য তা হল লব্ধ বিদ্যা ইত্যাদির যে উৎকর্ষসাধনের ফলে সংস্কৃতি রচিত এবং বর্ধিত হয় সেই উৎকর্ষসাধনে সমাজের একটি সংখ্যালঘু গোষ্ঠীর অনন্য, অপরিহার্য, বিনিশ্চায়ক ভূমিকা থাকে।

সভ্য সমাজে সংস্কৃতির অন্তত দুটি স্তর দেখা যায়। একটি লোকসংস্কৃতি যেটির উদ্ভব ও অবস্থান জনজাতি এবং/অথবা গ্রামজীবনের ভিতরে; যেটিও শিক্ষানির্ভর এবং উৎকর্ষসাধনার দ্বারা কমবেশি চিহ্নিত, কিন্তু যেটি প্রাক্‌নাগরিক, সরল, পুনরাবৃত্তিপ্রধান, স্বল্পব্যাপী, বিকাশশীল জ্ঞানচর্চায় পরাঙ্মুখ, জটিল ও প্রবলতর নগরসভ্যতার চাপ থেকে আত্মরক্ষায় অসমর্থ। অন্যটিকে উচ্চসংস্কৃতি বা বিদগ্ধসংস্কৃতি বলা যায়, যার উদ্ভব ও অবস্থান নগরে যেখানে বহিরাগত নানা ভাবনাচিন্তার ঘাতপ্রতিঘাত, লেনদেন নিয়তই স্থানীয় প্রতিষ্ঠিত প্রত্যয় আর অভ্যাসকে উদ্বেজিত করে, যেখানে দ্বন্দ্ব এবং বৈচিত্র্যের ভিতর থেকেই জটিল জীবনবীক্ষা এবং সূক্ষ্ম প্রকাশভঙ্গি গড়ে তুলতে হয়, যেখানে সমাজের পরিধি বিস্তারধর্মী, যেখানে প্রতিযোগিতার চাপে সংস্কৃতির বিভিন্ন অঙ্গ নিয়ত উৎকর্ষসাধনে নিয়োজিত। এই উচ্চসংস্কৃতিরই অন্যতম বাহক এবং সুফল দর্শন ও বিজ্ঞান, বিশ্ববিদ্যালয় ও গবেষণাকেন্দ্র, মার্গসংগীত ও ইট-পাথরের স্থাপত্য, রঙ্গালয় ও সাহিত্য। যেহেতু আমরা সকলেই সাহিত্যসেবী, অন্তত সাহিত্য-ভোক্তা, সে কারণে সংস্কৃতির অন্যান্য অঙ্গের আলোচনা সরিয়ে রেখে সাহিত্যের দিকেই মনঃসংযোগ করা যাক। ভাষা ছাড়া সাহিত্য সম্ভব নয়। এক হিসেবে যা কিছু ভাষায় প্রকটিত তাকেই সাহিত্য বলা যায়। যায় বটে, যেমন যা কিছু মানুষের রচনা তাকেই সংস্কৃতি বলা যায়, কিন্তু সাধারণ প্রয়োগে সংস্কৃতির মতোই সাহিত্যকেও আমরা সীমাবদ্ধ ব্যক্তার্থে নিবদ্ধ করে থাকি। এই সীমাবদ্ধতা সংগত, কারণ এই চৌহদ্দির ভিতরেই সাহিত্যের বিশিষ্টতা নিয়ে আলোচনা ফলপ্রসূ হতে পারে। ভাষাব্যবহারের সেই অংশই সাহিত্যপদবাচ্য যেখানে শব্দ এবং পরস্পরের অন্বয়বোধক পদসমষ্টি ব্যঞ্জনাসমৃদ্ধ হয়ে উঠেছে, যেখানে অস্তিত্বের গূঢ় এবং মৌল অনুভবগ্রাম ভাষার বিমূর্তনে ধৃত ও উদ্ভাসিত, যেখানে যা নিতান্তই উদ্‌বায়ী ঘটমান ভাষার আলম্বে তা নিত্যতা না হোক দীর্ঘস্থায়িতার অভিজ্ঞান-চিহ্নিত হয়েছে। আমরা প্রাত্যহিক জীবনে যে কথাবার্তা বলি, প্রয়োজনে যে চিঠিপত্র লিখি, নেতারা যেসব বুলি আওড়ান, খবরের কাগজে আকাশবাণীতে বা দূরদর্শনে যেসব প্রতিবেদন ও মন্তব্য রোজকার রোজ চটপট বানিয়ে ছড়িয়ে দেওয়া হয় সেগুলিও সাহিত্যের উপাদান বটে, কিন্তু তারা সাহিত্য নয়। লব্ধ ভাষার উৎকর্ষসাধন থেকেই সাহিত্যের জন্ম।

এখানেও উচ্চসাহিত্য এবং লোকসাহিত্যের স্তরভেদ আছে। ধারাবাহিকতা প্রসঙ্গে এই ভেদের যে দিকটি বিশেষভাবে লক্ষণীয় সেটি হল যে উচ্চসাহিত্য অল্পসংখ্যক গুণিজনের দ্বারা রচিত হলেও তা বহুস্থানকালপাত্রব্যাপী

সভ্যতার সূচক এবং তার ধারাবাহিকতা জটিল ও দূর-বিস্তৃত সমাজের ইতিহাসে অনুস্যূত। অপরপক্ষে লোক-সাহিত্যের ধারাবাহিকতা নিজের ছোটো আঞ্চলিক পরিধি আর জনগোষ্ঠীর মধ্যেই প্রধানত আবদ্ধ থাকে। উচ্চসংস্কৃতির ও উচ্চসাহিত্যের ঐতিহ্য এবং লোকসংস্কৃতির ও লোকসাহিত্যের ঐতিহ্যের মধ্যে অলক্ষ্যে নিয়ত আদ্রবণ ও সংশ্লেষ চলে; কিন্তু কোনো সংস্কৃতির পরিধির বিস্তারের জন্য বিদগ্ধ সাহিত্যসংস্কৃতির উপস্থিতি একটি অবশ্য শর্ত। ভাবুক, সাহিত্যিক, দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক, ঐতিহাসিকদের নিয়ত উৎকর্ষসাধনা ছাড়া কোনো সংস্কৃতির যেমন সমৃদ্ধি অকল্পনীয়, তেমনি স্থানকালপাত্রে তার বহুপ্রসারী ও পরিব্যাপ্ত ধারাবাহিকতাও অসম্ভব। আদমসুমার অনুসারে সমকালীন ভারতবর্ষে সহস্রাধিক ভাষা বিদ্যমান। এদের ভিতরে অনেকগুলিই স্থানিক বাচনগত ভাষামাত্র; যেগুলি স্বাধীন ভারতের সংবিধানে জাতীয় ভাষা হিসেবে ঘোষিত সেগুলির মধ্যেও কোনোটিকে প্রকৃত অর্থে সর্বভারতীয় ভাষা বলা চলে না। অতীতে যদি কোনো সর্বভারতীয় সাহিত্যসংস্কৃতির ধারাবাহিকতা থেকে থাকে তার বাহন ছিল প্রথমে সংস্কৃত, পরে ফারসি, এবং তারপরে ইংরেজি। এখনো ভাবনাচিন্তা বা সাহিত্যের ক্ষেত্রে সর্বভারতীয় যোগ বজায় রাখবার এবং গড়ে তোলবার জন্য আমাদের মুখ্য নির্ভর ইংরেজি। সংস্কৃত, ফারসি, ইংরেজি—প্রত্যেকটিই বহিরাগত ভাষা। বিভিন্ন যুগে এইসব ভাষা চর্চার সুযোগ যাঁরা পেয়েছেন এবং তা গ্রহণ করেছেন এই বিরাট দেশের অধিবাসীদের মধ্যে তাঁরা নিতান্তই মুষ্টিমেয়। এবং তাঁরা প্রায় সকলেই আপন-আপন সমাজের উচ্চকোটির মানুষ। আমাদের গণতন্ত্রী বা সমাজতন্ত্রী প্রতিন্যাসে সংখ্যালঘিষ্ঠদের এই প্রাধান্য অন্যায্য ঠেকাই স্বাভাবিক, কিন্তু সমসাময়িক কালের গণতোষক রাজনৈতিক জিগিরের প্রভাবে পড়ে এই নিতান্ত সূপ্রত্যক্ষ ব্যাপারটিকে যদি আমরা ভুলি অথবা নানাপ্রকারে চাপা দিতে চাই, তাতে আঞ্চলিক ধারাবাহিকতা যদি বা রক্ষা পায় সর্বভারতীয় সাংস্কৃতিক ঐক্য, ধারাবাহিকতা এবং বিকাশের সম্ভাবনা রুদ্ধ হবার প্রবল আশঙ্কা আছে। উনিশ শতক ধরে এবং বিশ শতকের প্রথমার্ধে যাঁরা বাঙলা সাহিত্যকে তাঁদের মেধা, নিষ্ঠা, পরিশ্রম আর আনুগত্য দিয়ে সমৃদ্ধিশালী করে তুলেছিলেন তাঁরা সকলেই বাঙলা ভাষার চর্চা করা ছাড়াও ইংরেজিতে কৃতবিদ্য ছিলেন, অনেকে একই সঙ্গে সংস্কৃতে, কেউ কেউ ফারসিতেও সুপণ্ডিত ছিলেন। আজকের বাঙালি সাহিত্যিক, চিন্তক এবং পাঠকরা যদি ইংরেজি এবং সংস্কৃত দুটিকেই অবহেলা করে শুধু বাঙলাই চর্চা করেন তাহলে তাঁরা শুধু ভারতের অন্য-অন্য অঞ্চল থেকেই বিচ্ছিন্ন হবেন না, তাঁদের ধারাবাহিকতা ক্রমে গ্রাম্য, সংকীর্ণ, পুনরাবৃত্তিপ্রধান ও বিশ্ববিমুখ হয়ে উঠবে। উৎকর্ষের অভীপ্সা এবং উদ্ভোগ ছাড়াও এক ধরনের বিনোদন সাহিত্য তৈরি হয়—তার আবেদন সাময়িক ও অগভীর—তা দরিদ্র ও ব্যঞ্জনারিক্ত। বর্তমানে বাঙলাভাষায় এই ধরনের সাহিত্যের ছড়াছড়ি।

দুই

সভ্যতার ইতিহাসে যেমন ধারাবাহিকতা তেমনই অবচ্ছিন্নতা বারবার চোখে পড়ে। সমাজবদ্ধ মানুষ যেখানে বেশ কিছুকাল ধরে বাস করছে এমন কোনো অঞ্চলে কচিৎ কখনো একেবারে জনবিহীন হয়, কিন্তু মানুষের বসবাস থাকলেও নানা কারণে সেখানকার প্রতিষ্ঠিত সভ্যতাসংস্কৃতি বিলুপ্ত হতে পারে। বার্ধক্য এবং মৃত্যুর অনিবার্যতা সত্ত্বেও তার কারণ-নির্ণয়ে যেমন আয়ুর্বিদেরা এখনও পর্যন্ত অপারগ, তেমনই প্রতি সভ্যতার পতন সুনিশ্চিত বটে, কিন্তু তার কারণ নিয়ে ঐতিহাসিকদের মধ্যে বিস্তর মতভেদ আছে। তবে পতনের অবশ্যম্ভাবিতা সর্বস্বীকৃত, এবং পতনের ফলে ধারাবাহিকতায় পুরোপুরি না হলেও অনেকটা ছেদ পড়ে। প্লাবনে, অগ্ন্যুৎপাতে, মহামারীতে বা মহাযুদ্ধে সেই অঞ্চল থেকে সমস্ত মানুষ লোপ না পেলে ধারাবাহিকতা একেবারে সমাপ্ত হয় না; হয়তো-বা অবসিত সভ্যতাসংস্কৃতির কিছু গোপন বীজ আবার অনেক পরবর্তী কালে সক্রিয় হয়ে উঠতেও পারে। কিন্তু যেটি লক্ষ না করে উপায় নেই সেটি হল যে কোনো অঞ্চলে একটি সভ্যতার উত্থান ঘটলে সেটির অবক্ষয় এবং বিনাশও শেষ পর্যন্ত প্রতিষেধনীয়, এবং কোনো দেশের ইতিহাসেই ক্রমিকতা সমান গাঢ়তায় আর গতিতে বহমান থাকে না। এই ছেদ রাষ্ট্রিক ইতিহাসে সবচাইতে প্রত্যক্ষ—অন্তর্দ্বন্দ্বের ফলেই হোক বা বহিরাগত শক্তির আক্রমণের ফলেই হোক, রাষ্ট্রব্যবস্থা সচরাচর বেশি দ্রুতগতিতে এবং নাটকীয়ভাবে ভাঙে। কিন্তু সমাজব্যবস্থা, আর্থব্যবস্থা এবং সংস্কৃতিতেও ছেদ মোটেই দুর্লক্ষণীয় নয়। মিশরীয়, ফিনিশীয়, সুমারীয়, আসিরীয়, ব্যাবিলনীয়, মায়া অথবা আজ্‌টেক্—এসব প্রাচীন এবং সমৃদ্ধ সভ্যতাসংস্কৃতির উত্থাপতনের কাহিনী শিক্ষিতজনের সুপরিজ্ঞাত।

পশ্চিমের ক্ষেত্রে ইতিহাসকে প্রাচীন, মধ্যযুগীয় ও আধুনিক—এই তিন পর্যায়ে ভাগ করে দেখা অনেকদিন আগেই প্রচলিত হয়। ইতিহাসের ধারাবাহিতা এবং বিপর্যয়কে সেখানকার কোনো-কোনো তাত্ত্বিক আপন-আপন ভাবে এক-একটি সর্বমানবীয় ইতিহাসদর্শনে সমাহিত করবার চেষ্টা করেছেন। ভিকো, কঁদরসেত, হেগেল, কোঁত্ থেকে ক্রোচে, পারেটো, স্পেংলার, গর্ডন চাইল্ড্, টয়েনবি প্রভৃতি এই প্রচেষ্টাক্ষেত্রে কৌতিমান চিন্তক। তবে এ ব্যাপারে কার্ল মার্কস সবিশেষ খ্যাতিসম্পন্ন এবং আমাদের শতকে সম্ভবত সবচাইতে প্রভাবশীল। তিনি ইতিহাসকে দেখেছেন পঞ্চাঙ্ক নাটক হিসেবে—প্রথম অঙ্কে ব্যক্তিস্বত্বহীন বা যৌথস্বত্বভিত্তিক আদিম সমাজ; তার পর একে-একে প্রাচীন সভ্যতা, ফিউড্যাল সভ্যতা, বুরজোয়া সভ্যতা এবং ভবিষ্যতের সমাজতান্ত্রিক সভ্যতা। প্রত্যেকটিই দাঁড়িয়ে আছে বিশেষ ধরনের উৎপাদনব্যবস্থা ও সম্পর্কের উপরে। এদের ভিতর থেকেই সঞ্জাত শক্তি প্রতিষ্ঠিত ব্যবস্থার বিকাশ এবং বিনাশ ঘটিয়ে বিপ্লবের ভিতর দিয়ে পরবর্তী সভ্যতাকে নিয়ে আসে। এটিই ইতিহাসের ডায়ালেকটিক বা দ্বান্দ্বিক সংশ্লেষ-ক্রিয়া; সমাজের আর্থব্যবস্থাই এটির বাস্তব ভিত্তি এবং এটি শ্রেণীসংগ্রামের ভিতর দিয়ে প্রকটিত হয়।

চীন, ভারত এবং রাশিয়া নিয়ে মার্কস কিছুটা চর্চা করে থাকলেও তাঁর ইতিহাসদর্শন প্রকৃতপক্ষে পশ্চিম ইয়োরোপকে অবলম্বন করেই গড়ে উঠেছিল। ইংরেজ-অধিকারের পূর্ববর্তী ভারতবর্ষের ইতিহাসে তিনি ডায়ালেকটিক-এর ক্রিয়া দেখতে পান নি। তাঁর বিচারে শাসনশোষণের সূত্রে এই উপমহাদেশে আধুনিক যুগের সূত্রপাত করে ইংরেজ। ইংরেজপূর্ব ভারতের ধারাবাহিকতা বা অবচ্ছিন্নতা বা বিবর্তন বিষয়ে মার্কসের নিজের লেখা আলোকপাত করে না। তবে এই অন্বেষী মনীষী নিজের শিক্ষার জন্য ভারত-ইতিহাসের একটি কালনির্ঘণ্ট তৈরি করেছিলেন, এবং মার্কসপন্থী কিছু ঐতিহাসিক এদেশের ইতিহাসের কোনো-কোনো পর্বের আর্থিক-দ্বান্দ্বিক ব্যাখ্যা দেবার চেষ্টা করেছেন। অবশ্য পশ্চিম ইয়োরোপের ইতিহাসের ক্ষেত্রেও মার্কসের পর্ব-বিভাগ এবং দ্বান্দ্বিক সংশ্লেষ বা ডায়ালেকটিক্যাল ব্যাখ্যা নিয়ে শুধু অন্য ঐতিহাসিকরা নন, মার্কসপন্থীরা পর্যন্ত অনেকে সংশয়ী। ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে সেইজাতীয় ব্যাখ্যার সূচনামাত্র হয়েছে; সমগ্রভাবে ভারত-ইতিহাসের মার্কস-পন্থী ব্যাখ্যা এতাবৎ দলীয় প্রচারকদের ভিতরেই সীমাবদ্ধ।

আপাতদৃষ্টিতে এই উপমহাদেশে সভ্যতার ইতিহাসে অনেকগুলি পর্ব এবং অনেকগুলি আঞ্চলিক ঐতিহ্য চোখে পড়ে যাদের ভিতরে সময়য় অথবা ধারাবাহিকতার চাইতে অবচ্ছিন্নতার উপস্থিতি অনেক ক্ষেত্রে বেশি প্রকট। সম্ভবত আদিযুগে এখানে কিছু নিগ্রোবটু গোষ্ঠীর অবস্থান ছিল। তাদের অনস্ক্রিক কথাভাষার এবং আদিম বিশ্বাস আর আচার-আচরণের কিছু ভগ্নাবশেষ পরবর্তী কালে রয়ে গেছে। আচার্য সুনীতিকুমারের মতে, তামিলভাষা-ভাষী অঞ্চলে ইরুল, কাড়র, পনিয়ন ও কুরুম্ব গোষ্ঠীদের মধ্যে সম্ভবত তাদের অল্প কিছু বংশধর এখনো বিদ্যমান।

মোঙ্গল-তিব্বতীদের উপস্থিতি এদের চাইতে কিছুটা প্রকট; কিন্তু এই কিরাতবংশীয়েরা প্রত্যন্তবাসী এবং উপমহাদেশে এদের ভূমিকা খুবই সীমাবদ্ধ। অপর পক্ষে ভাষায় এবং ধর্মবিশ্বাসে ও আচরণে অস্ট্রিক বা নিষাদ উপাদান বেশ প্রাচীন এবং পরিব্যাপ্ত হয়ে থাকলেও যেসব ভাষা ও উপজাতিকে এখন অস্ট্রিক বলে গণ্য করা হয় জনসংখ্যার দিক থেকে তারা প্রায় নগণ্য, এবং সাংস্কৃতিক অস্তিত্বের দিক থেকে তারা পরস্পর থেকে এবং উপমহাদেশের প্রধান-প্রধান সংস্কৃতি থেকে অনেকটাই বিচ্ছিন্ন। মুণ্ডা বা কোল এবং খাসি ভাষাভাষীরা অবশ্যই ভারতবাসী; কিন্তু তথাকথিত ভারতীয় সংস্কৃতির ধারাবাহিকতায় তাদের স্থান এবং ভূমিকা এখনো পর্যন্ত অনির্দিষ্ট।

ভারতের সভ্যতার ইতিহাস শুরু হয়েছিল সিন্ধু উপত্যকায়। গত পঞ্চাশ-ষাট বছরের প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণার ফলে জানা গেছে—এই সভ্যতা হরপ্পা আর মহেনজোদারোর বিস্ময়কর রকমের সুপরিকল্পিত নগর দুটিতেই আবদ্ধ ছিল না। কিন্তু সিন্ধু-সভ্যতার লিপি এখনো পর্যন্ত ঐতিহাসিকদের অনায়ত্ত। তার নগরপরিকল্পনা, স্থাপত্য, ইতস্ততবিক্ষিপ্ত মূর্তি এবং সমত্নরচিত অসংখ্য সীল বা নামমুদ্রা, বিভিন্নভাবে শিল্প ও যোনির রূপায়ন নানা আভাস দেয় বটে, কিন্তু অন্তর্লোকে প্রবেশের পথ রুদ্ধ। এবং প্রায় সহস্রবর্ষব্যাপী এই সভ্যতার নাগরিক ঐতিহ্য কীভাবে পরবর্তী প্রায় সহস্র বৎসর ধরে বিলুপ্ত হয়ে রইল তার সর্বজনগ্রাহ্য কোনো ব্যাখ্যা এখনো পর্যন্ত মেলে নি। এক হিসেবে বলা যায়, ভারতীয় সংস্কৃতি ও সাহিত্যের ইতিহাসে সিন্ধু-সভ্যতার পতন অবচ্ছিন্নতার প্রথম নাটকীয় উদাহরণ। ধ্বংসকর্মের বর্বরতায় বেদ-রচয়িতারা ভ্যানডাল, ভিসিগথ বা হূনদের চাইতে কম পারদর্শী বা নির্মম ছিলেন না। এবং যদিও হরপ্পার পতনের প্রায় দেড়-দুই সহস্রাব্দ পরে হিন্দু সমাজসংস্কৃতি-ধর্মের উদ্ভব ও বিবর্তনে সিন্ধুসভ্যতা, অস্ট্রিক লোক-সংস্কৃতি ও দক্ষিণদেশের দ্রাবিড় সভ্যতা-সংস্কৃতির ভূমিকা আর্যসংস্কৃতির ভূমিকার চাইতে সম্ভবত বেশি বই কম নয়, তাহলেও ইতিহাসের প্রাক্‌পর্বের সঙ্গে পরবর্তী পর্বের সংযোগসূত্রটা এতাবৎ অনেকটাই তমসাচ্ছন্ন।

খ্রীষ্টপূর্ব পনেরো শতক থেকে খ্রীষ্টীয় আঠারো শতক পর্যন্ত এই উপমহাদেশের অধিবাসীদের বারবার বহিরাগত আগ্রাসী জনসমূহের আক্রমণের অভিজ্ঞতা ঘটে। রবীন্দ্রনাথ গেয়েছিলেন বটে যে যারা বাইরে থেকে এসেছিল তারা এখানে একদেহে লীন হল, কিন্তু সাম্প্রতিক ভারত-ইতিহাসের চেহারা দেখে এবং প্রাগাধুনিক ভারত-ইতিহাসের যেটুকু বিবরণ নির্ভরযোগ্য তা বিবেচনা করে এই একদেহের প্রত্যয় একেবারে প্রশ্নাতীত ঠেকে না। রক্তের শুদ্ধতা সম্ভবত কেউই বজায় রাখতে পারেন নি, কিন্তু মনের ক্ষেত্রে, সমাজসংগঠনে, সাহিত্য-সংস্কৃতির স্তর নির্ণয়ে যথেষ্ট বিভেদ কি আগাগোড়াই থেকে যায় নি? আর্য এবং অনার্য, ব্রাহ্মণ, শূদ্র এবং অস্পৃশ্য, সংস্কৃত ও প্রাকৃত-অপভ্রংশ, হিন্দু-বৌদ্ধ-মুসলমান-খ্রীষ্টান-শিখ—এদের মধ্যে যোগ থাকা সত্ত্বেও পার্থক্য, এমন কি প্রকাশ্য অথবা প্রচ্ছন্ন দ্বন্দ্ব কি প্রায় অনতিক্রম্যভাবে বিদ্যমান ছিল না? পশ্চিমে তবু কয়েকশতাব্দীব্যাপী রোমক-সাম্রাজ্য, এবং পরে রোম্যান ক্যাথলিক চার্চসংগঠন সাংস্কৃতিক ঐক্য ও ধারাবাহিকতা গড়ায় এবং রক্ষা করায় অনেকটা সহায়তা করে। ভারত-উপমহাদেশে ষোড়শ মহাজনপদের কাল থেকে আওরঙ্গজেবের কাল পর্যন্ত কোনো সাম্রাজ্যই খুব বেশিকাল টেকে নি, এবং রোম্যান ক্যাথলিক চার্চের সঙ্গে তুলনীয় উপমহাদেশ-ব্যাপী কোনো ধর্মীয় সংগঠনও গড়ে ওঠে নি। এখানে কয়েকটি ব্যাপক কিন্তু উচ্চকোটির সংস্কৃতি এবং অনেক-গুলি আঞ্চলিক, সীমাবদ্ধ ও নিম্নকোটির সংস্কৃতি পরপর এবং পাশাপাশি বিরাজ করে এসেছে। তাদের মধ্যে লেনদেন এবং সংঘাত হয়েছে, কিন্তু তারা মিলেমিশে সর্বভারতীয় একটি সংস্কৃতির ধারাবাহিকতা রচনা করেছে, এ দাবি তথ্যসমর্থিত নয়। যেসব ব্যাপক উচ্চসংস্কৃতি এই উপমহাদেশে বিভিন্ন যুগে বিস্তার লাভ করেছে

সেগুলি মুখ্যত সমাজের উচ্চকোটির মানুষদের দ্বারা উদ্ভাবিত ও পরিপোষিত, এবং সেগুলিতে উচ্চকোটির মানুষদের বিশেষ অধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত। ভাষা এবং সাহিত্যের ক্ষেত্রে এই ব্যাপারটি খুবই স্পষ্ট। বেদমন্ত্রে অনার্যদের অধিকার অস্বীকৃত, এমন কি পরে স্ত্রীলোক এবং ব্রাহ্মণেতর জাতিদের পক্ষেও বেদপাঠ নিষিদ্ধ হয়। খ্রীষ্টীয় প্রথম সহস্রাব্দেই বৈদিক ভাষার অর্থভেদ পণ্ডিতদের পক্ষেও দুরূহ হয়ে পড়ে; ব্রাত্য বঙ্গদেশে বেদজ্ঞ পণ্ডিতের অভাব ঘটায় উনিশ শতকে দেবেন্দ্রনাথকে কাশীর দ্বারস্থ হতে হয়েছিল। পরবর্তী কালে যে বিরাট সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্য গড়ে ওঠে তাও ছিল সমাজের উচ্চস্তরে সীমাবদ্ধ। সংস্কৃত মহাভারত ও রামায়ণ, পুরাণ ও ধর্মশাস্ত্র, ভাস, শূদ্রক, কালিদাস, ভবভূতি, ভারবি, বিশাখদত্ত, সুবন্ধু ও বাণভট্ট, সাংখ্য, ন্যায়, বৈশেষিক ও মীমাংসা-দর্শন—এই সমৃদ্ধ ও বিচিত্র সাহিত্যের পাঠকসমাজ চির-দিনই সমাজের বিদগ্ধ উনজন। যাস্ক, পাণিনি ও পতঞ্জলি সংস্কৃতকে লোকভাষা হিসেবে উল্লেখ করেছেন বটে, কিন্তু সেই ভাষা যাঁরা চর্চা করে আয়ত্তে এনেছিলেন তাঁরা যে সংখ্যাগুরু সাধারণ-জন ছিলেন না, এ নিয়ে কোন মতভেদ নেই। প্রাচীনকালে সর্বভারতীয় যে সংস্কৃতির আভাস মেলে তার ধারক সংস্কৃত ভাষা এবং সেই ভাষার ব্যবহার ও অনুশীলন যাঁরা করতেন তাঁরা স্পষ্টতই বিদগ্ধ অভিজন। এই ভাষা প্রকৃতপক্ষে কারো মাতৃভাষা নয়, বিদগ্ধজনের কৃত্রিম সর্বভারতীয় ভাষা হিসেবেই এটি দীর্ঘকাল প্রচলিত ছিল। ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির বিরুদ্ধে বৌদ্ধধর্ম এবং সংস্কৃতের প্রতিদ্বন্দ্বী রূপে আঞ্চলিক প্রাকৃত থেকে পালি দেখা দেয়; কিন্তু শেষ পর্যন্ত বৌদ্ধধর্ম ভারতবর্ষ থেকে প্রায় বিলুপ্ত হয়ে যায়, এবং পালি সাহিত্যের ভাষাও সংস্কৃতের মতোই কৃত্রিম হয়ে ওঠে।

দক্ষিণদেশে যে দ্রাবিড় ভাষাগোষ্ঠী প্রতিষ্ঠা লাভ করে সেগুলির প্রভাব উত্তরের সংস্কৃত ও ইন্দো-আর্য ভাষা-গুলির উপরে পড়েছিল, এবং তামিল, তেলুগু, কন্নাড় ও মালয়ালম ভাষাগুলিও সংস্কৃতের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে। কিন্তু তাহলেও দ্রাবিড় ভাষা আর সাহিত্য উত্তরের ভাষা ও সাহিত্যগোষ্ঠী থেকে মৌলিকভাবেই পৃথক। আবার মুসলমান শাসনকালে ফারসি হয়ে ওঠে সর্বভারতীয় যোগাযোগের জন্য প্রধান ভাষা; শুধু সরকারি কাজে নয়, সাহিত্যরচনাতেও এই ভাষা ব্যবহৃত হয়; এটি বিদগ্ধজনের অবশ্যশিক্ষণীয় ভাষা হয়ে ওঠে। এবং ইংরেজ আমলে সংস্কৃত আর ফারসিকে হঠিয়ে ইংরেজি হয়ে ওঠে সর্বভারতীয় ভাষা, যদিও সংস্কৃত আর ফারসির মতোই এ ভাষায় দখল এবং এর ব্যবহার উপরতলার শিক্ষিত-জনের মধ্যেই আবদ্ধ থেকে গেছে।

ফলত ভারতীয় সাহিত্য-সংস্কৃতির ধারাবাহিকতা নিয়ে বিবেচনায় যে ঐতিহাসিক-ভৌগোলিক মানচিত্রটি ক্রমে স্পষ্টতর হয়ে ওঠে সেটি এই ধরনের: ১। কয়েকটি সমৃদ্ধ, বহু-অঞ্চলব্যাপী, 'বৃহৎ' ঐতিহ্য বা উচ্চ সংস্কৃতি যেগুলি কখনো পাশাপাশি, কখনো একটির বিলোপের পর অন্যটি স্বতন্ত্রভাবে কয়েক শতাব্দী বোপে প্রবাহিত (যেমন সিন্ধু-সভ্যতা, বৈদিক সাহিত্য-সংস্কৃতি, হিন্দুসংস্কৃতি সাহিত্য ও ধর্ম, বৌদ্ধ ধর্ম ও পালি সাহিত্য, দ্রাবিড়-তামিলাদি ভাষা ও সংস্কৃতি, ফারসি ভাষা ও মুসলিম ধর্ম, ইংরেজি ভাষা ও আধুনিক সংস্কৃত); ২। সহস্রাধিক মৌখিক ভাষা, উপভাষা, অনক্ষরিত ভাষা যা আঞ্চলিক জনজাতি ও লোকসংস্কৃতির সংক্ষিপ্ত ও সংকুচিত পরিধির মধ্যে সীমাবদ্ধ; এবং ৩। কয়েকটি বড়ো এবং সুপ্রতিষ্ঠিত অক্ষরসম্পন্ন প্রাদেশিক বা আঞ্চলিক সংস্কৃতি ও সাহিত্য যেগুলি মুসলমান শাসনকালে উদ্ভূত হয়, ইংরেজ আমলে সমৃদ্ধিলাভ করে এবং যেগুলিকে স্বাধীন ভারতবর্ষে জাতীয় ভাষাসমূচ্চয়ের স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। এ ছাড়া সম্প্রতি-কালে ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলে 'দলিত' সাহিত্য ও সংস্কৃতির যে আন্দোলন দেখা দিয়েছে সেটিকেও আর অগ্রাহ্য করা সম্ভব নয়।

এইসব বিচিত্র বহুমুখী সাংস্কৃতিক-উপাদান এবং ধারা-দের ভিতরে অবশ্যই দৃশ্য ও অদৃশ্যভাবে আত্তরণ, সংঘাত আর সংশ্লেষ ঘটেছে, কিন্তু সবকিছুকে মিলিয়ে-মিশিয়ে

একটি সর্বভারতীয় সাংস্কৃতিক ঐক্য ও ধারাবাহিকতার প্রোজ্জ্বল কল্পনা উনিশ শতকের শিক্ষিত নগরবাসী জাতীয়তাবাদী ভাবুক আর নেতাদের মধ্যেই সম্ভবত প্রথম আকার পায়। কিন্তু যে ঐক্য আর ধারাবাহিকতার কথা তাঁরা ভাবেন আর প্রচার করেন সেটি ছিল তাঁদের আপন আপন পছন্দসই নির্বাচনের দ্বারা নিরূপিত ও সীমাবদ্ধ। দয়ানন্দ বৈদিক ধর্ম, সংস্কৃতি ও সাহিত্যকে এই ঐক্য আর ধারাবাহিকতার একমাত্র উৎস হিসেবে ব্যাখ্যা করলেন। তাঁর মতো অসহিষ্ণু, এবং আগ্রাসী ভাবে না হলেও ব্রাহ্ম ভাবুকদের মধ্যে অনেকের কাছে উপনিষদাবলীই মুখ্য উৎসরূপে প্রতিভাত হয়। বঙ্কিমচন্দ্র ও টিলকের কাছে এই উৎস ভগবদ্‌গীতা। এঁরা যে ভারতীয় ঐক্য এবং ধারাবাহিকতা থেকে ইসলাম ধর্ম, পাঠান-মোগল যুগের সংস্কৃতি এবং ফারসি ভাষা এবং সাহিত্যকেই বাদ দিলেন তাই নয়, গোঁড়া হিন্দুদের ও বর্ণহিন্দুসমাজের বাইরেকার বিচিত্র, ব্রাত্য, অবহেলিত বহু আচারসংস্কার, দেবদেবী, রীতিনীতিকেও হয় অপজাত বলে সমালোচনা করলেন, নয় তাঁদের ধারাবাহিকতার ভাবচিত্র থেকে বাদ দিলেন।

ভারতবর্ষের ঐক্যসাধনের জন্য তাঁদের আন্তরিক আগ্রহ এবং প্রযত্ন অবশ্যই শ্রদ্ধার যোগ্য। কিন্তু এই উপমহাদেশের বাস্তব রূপের সঙ্গে তাঁদের কল্পিত ভাব-রূপের ব্যবধান রয়ে গেল, যা বর্তমান এবং যা কাম্য দুয়ের ভিতরে পার্থক্যকে প্রচারের দ্বারা বিলুপ্ত করতে গিয়ে তাঁরা যেমন নির্ভরযোগ্য ইতিহাসরচনাকে ব্যাহত করলেন তেমনি বিভিন্ন সাংস্কৃতিক সমূহের বা সম্প্রদায়ের মধ্যে বিরোধকে বাড়িয়ে তোলায় অনিচ্ছাকৃতভাবে সহায়তা করলেন। হিন্দু-মুসলমানে আগাগোড়াই ভেদ ছিল, সেটি সচেতন প্রতিযোগিতা এবং দ্বন্দ্বের তীক্ষ্ণতা পেল এই শতকের প্রথম পাদে, এবং তার ফলে এই উপ-মহাদেশ দুই স্বাধীন রাষ্ট্রে বিভক্ত হল। আবার ভাষা ও সংস্কৃতিগত বিরোধ যেমন পাকিস্তানকে দ্বিখণ্ডিত করে পূর্বপ্রান্তে স্বাধীন বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠা ঘটাল অন্যদিকে তেমনি সংস্কৃতি, ভাষা ও ধর্মীয় পার্থক্য ভারতরাষ্ট্রের ভিতরের নানা বিরোধকে প্রকট করে তুলেছে।

ভারত-উপমহাদেশে একটি, দুটি, তিনটি অথবা অনেকগুলি রাষ্ট্রের থাকা বা না-থাকা এখানকার সাধারণ মানুষকে সম্ভবত চিন্তিত করে না। কিন্তু যাঁরা শিক্ষিত, কোনো জটিল অবস্থার পূর্বপর বিবেচনায় যাঁরা সক্ষম, যাঁরা সম্ভাব্য বিকল্পগ্রাম থেকে বিচারবিবেচনানিয়ন্ত্রিত নির্বাচনে আগ্রহী, তাঁদের পক্ষে বোঝা মোটেই কঠিন নয় যে বৈরপ্রবণ কয়েকটি রাষ্ট্র বা উপরাষ্ট্রে বিভাজন কতটা ক্ষতিকর হতে পারে। ভারতের ঐক্য আমাদের কাম্য, এবং যদি এই ত্রিধাভক্ত উপমহাদেশ কোনো দিন মৈত্রী এবং স্বাধীন সহযোগের ভিত্তিতে কোনো সমামেল বা কনফেডারেশনব্যবস্থায় পরস্পরের সঙ্গে সম্বন্ধীকৃত হয় তাহলে তাতে সকলেরই কল্যাণ। কিন্তু যেমন বিত্ত বা সম্মান বা সামর্থ্য চাই বললেই তা মেলে না, তার জন্য যথোপযোগী উদ্যম আর পারিবেশিক অনুকূলতার প্রয়োজন হয়, তেমনি কোনো বিরাট ও বিচিত্র দেশের একতা শুধু জিগিরের পুনরাবৃত্তি দ্বারা অর্জিত হয় না। ঐক্যের জন্য ধারাবাহিকতার উত্তরাধিকারচেতনা যেমন দরকার, তেমনি দরকার বিদ্যমান অবস্থা বিষয়ে নির্ভরযোগ্য বাস্তব-জ্ঞান এবং ভবিষ্যতের নির্দেশবাহী অভীপ্সায় স্পষ্টতা, দৃঢ়তা ও একাগ্রতা। অতীত থেকে ধারাবাহিকভাবে যা কিছু আমাদের কালে বর্তেছে তার সবই গ্রহণীয় নয়। ভারতের প্রায় সর্বত্র, বিশেষ করে হিন্দুসমাজে কিন্তু শুধু-মাত্র হিন্দুসমাজেই নয়, যে জাতিপংক্তিবিন্যাসের ব্যবস্থা বহুকাল ধরে ধারাবাহিক সূত্রে প্রতিষ্ঠিত সেটিকে অবলম্বন করে এবং প্রশ্রয় দিয়ে ভবিষ্যতের সবল, বিকাশশীল, ঐক্যবদ্ধ ভারত গড়ে উঠবে, এ প্রস্তাব অসংগত এবং যুক্তি-বিরুদ্ধ। আবার এই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য লৌকিক জগতের প্রতি যে অনীহা এবং সে সম্পর্কে যে অজ্ঞতা বহুকাল ধরে এদেশের মানুষের ভাবনায় এবং আচরণে নিরতিশয় প্রাধান্য পেয়ে এসেছে, ধারাবাহিক বলেই সেটি পোষণ-যোগ্য নয়। এদেশের সাংস্কৃতিক ইতিহাসে যেসব সূত্র

এবং উপাদান জড়তা, হীনতা, অন্যায়ের সঙ্গে রফা করে টিকে থাকবার প্রতিন্যাস, গোঁড়ামি প্রভৃতি থেকে মুক্তি পাবার সহায়ক সেগুলিকে পুনরাবিষ্কার করে প্রতিষ্ঠা দেওয়া শিক্ষিতজনের বিশেষ দায়িত্ব। যে বর্তমানের ভিতরে আমাদের বাস তার বৈচিত্র্য সম্পর্কে নির্ভরযোগ্য জ্ঞান অর্জন এবং জ্ঞানকে শিক্ষার মারফত বহুজনের কাছে পৌঁছে দেওয়া, এক অঞ্চলের সাহিত্য আর সংস্কৃতির সঙ্গে অন্য অঞ্চলের সেতুবন্ধ রচনা করা, ভারত নামে আখ্যাত দেশের স্থানকালপাত্রে বাস্তবায়িত বহুমুখিতার সঙ্গে যথার্থভাবে পরিচিত হয়ে সেই জ্ঞানের ভিত্তিতে ঐক্য-রচনার সাধনায় আত্মনিয়োগ, এ সবই আমাদের প্রাথমিক এবং অলঙ্ঘনীয় কর্তব্য।

এই বৃহৎ কর্মকাণ্ডে নিখিল ভারত বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনের অতীতেও উল্লেখ্য ভূমিকা ছিল, আশা করা যায় ভবিষ্যতেও থাকবে। যাঁরা শিক্ষিত, যাঁরা ভাবতে পারেন, লিখতে পারেন, যাঁরা সংস্কৃতিমান এবং বিশেষ করে যাঁরা সাহিত্যিক সমাজের ঐক্যরচনায় এবং বিকাশে তাঁদের দায়িত্ব সমধিক। বাঙলাভাষাতে ভারতের বিভিন্ন ভাষা থেকে নির্ভরযোগ্য অনুবাদ, আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়-গুলিতে বিভিন্ন ভারতীয় ভাষা এবং সংস্কৃতি নিয়ে অনুশীলন আর গবেষণার ব্যবস্থা, প্রাচীন এবং সমকালীন ভারতের তথ্যনির্ভর, সুচিন্তিত ও সুসম্বদ্ধ সাংস্কৃতিক ও সাহিত্যিক ইতিহাস—এই দুরূহ, অধ্যবসায়ী এবং জরুরি কাজগুলিতে নিখিল ভারত বঙ্গসাহিত্য সম্মেলন যদি সাধ্যমত অংশ নিতে পারে তাহলে এই অনুষ্ঠান যথার্থই অর্থবহ হয়ে উঠবে।

ভ্রম সংশোধন

বর্ধমানের শিল্পী শ্রীমুকুল দে বর্তমানে দুশ-চিত্র-সংবলিত একটি বৃহৎ অ্যালবাম রচনায় ব্যাপৃত। আমাদের মার্চ (১৯৮৬) সংখ্যার ৯৭৬ পৃষ্ঠায় অ্যালবামটিকে কোষগ্রন্থ বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এই ত্রুটির জন্য আমরা মার্জনাপ্রার্থী।

সম্পাদক

সৈকত

শঙ্খ ঘোষ

আজ আর কোনো সময় নেই এই সমস্ত কথাই লিখে
রাখতে হবে এই সমস্ত কথাই যে নিঃশব্দ সৈকতে রাত
তিনটের বালির ঝড় চাঁদের দিকে উড়তে উড়তে
হাহাকারের রুপোলি পরতে পরতে খুলে যেতে দেয় সব
অবৈধতা আর সব হাড়পাঁজরের শাদাধুলো অবাধে
ঘুরতে থাকে নক্ষত্রে নক্ষত্রে শুধু একবার একবারই ছুঁতে
চায় ব'লে।

আর নিচে দুইপাশে কেয়াগাছ রেখে ভিতরের সরু
পথ যেমন গিয়েছে চলে অজানা অটুট কোনো মসৃণ
গ্রামের মুখে এখনো যে তা ঠিক তেমনই অক্ষত আছে
সেকথা বলাও শক্ত তবু এই সজল গহ্বর এই সর্বস্ব মাতন
নিয়ে এ রাতের সমুদ্রবিস্তার তার স্তনন শোনায় যতদূর

সে-পর্যন্ত জেগো না ঘুমন্ত জন ঘুমাও ঘুমাও ওই
গ্রামের উপরে উড়ে পড়ুক নিঃশব্দ সব বালি আর
তোমাকেও অতর্কিতে তুলে নিক নিঃসময় কোলে নিক
অন্ধকারে কিংবা আলো-আঁধারের জলসীমানায় নিক
পদ্মের কোমলভেদে মৃত্যু এসে দাঁড়াক জন্মের ঠোঁট ছুঁয়ে

আজ আর সময় নেই এই সমস্ত কথাই আজ লিখে
রাখতে হবে এই সমস্ত কথাই এই সমস্ত কথাই

এই রাত, এই নদী

বিশ্বজিত চৌধুরী

তখন নদীর দেহ ক্ষীণাঙ্গী তন্বীর মতো
দু তীরে স্মৃতির নামে জেগে আছে চর
চরের কাদায়-জলে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে চাঁদ, আর
পূর্ণিমা বলেছে এসে, 'বেঁচে থাকো আর কিছুকাল'।

ভিড়িতে তরুণ জেলে বাঁশিতে ছোঁয়াল তার বেদনার সুর
সে সুর ছড়িয়ে গেল জলে ও ডাঙায়
হাওয়ায় কাঁপল তার নায়ের বাদাম
বিরহী কৃষ্ণের নাও একাকী উথলে ওঠে ক্লান্ত যমুনায়।

রাত বাড়ে। অশ্বত্থ-ফোকর থেকে ডেকে ওঠে বিষণ্ণ তক্ষক
যেন প্রকৃতি গুমরে ওঠে আলো ও ছায়ায়;
জলিলগঞ্জের পাশে নদী, তার পাশে থেমে আছে রাত
নদীর কাঁধের বাঁকে সারারাত জেগে থাকে চাঁদ।

(বাংলাদেশ)

জীবনচরিত

জয়কৃষ্ণ কয়াল

এই বড়ো দোষ তার, এই বড়ো দোষ—
'হ্যাঁ' কিংবা 'না' স্পষ্ট কিছুই বলে না,
আলোর শব্দের গ্রামে—অন্তরঙ্গ সুরে
কী যে বলে—কিছুই বুঝি না।

নিসঙ্গ ঘাটের পাশে জলের কিনারে
পঞ্চজবা পুঁতেছিল মা,
দিদিকে বুঝিয়েছিল : জানিস শঙ্করী,
এই গাছ বড়ো হবে যত—
ফুলে ফুলে ডাল ভরে যাবে,
আর তোর ভাই তত…
দেবিস তখন।

দিদি কিংবা মা—কেউ আজ নেই ;
উঠোনে নীরক্ত রোদ সারাদিন শুয়ে
সদর পেরিয়ে গেলে উদাসীন মাঠ—
ঘনঘন ঘাটে ফিরে আসি :
সেই পঞ্চজবা গাছ মরে নি এখনও,
তাই বলে ডালভরা ফুল যাকে বলে
তারও চিহ্ন কোনোখানে নেই—
এদিকে শুকোয় ডাল, ওদিকে গজায়
তারই মধ্যে দুটো একটা ফুল…।

এই বড়ো দোষ তার, এই বড়ো গুণ
'হ্যাঁ' কিংবা 'না' স্পষ্ট কিছুই বলে না,
অথচ সে বলে কিছু—অন্তরঙ্গ সুর
না বুঝে আচ্ছন্ন তাতে কত রুদ্র দিন।

স্বদেশ

মনিরুজ্জামান

দেশ আমার, গভীর অন্ধকারে সূর্য এনে দাও, এখনও
ধূসর প্রান্তরে কুয়াশা-কুহক দেখ। মিথ্যার প্রলম্বিত ভাষা।
প্রহৃত যৌবন এই জীবনের দ্রাক্ষাকুঞ্জে স্বপ্নের ভিতর হাঁটে
অসচেতন। দেশ আমার, ধাবমান অশ্বের মতো এবং বীর্যবান
সূর্যের পিণ্ড যেমন সবেগে লাফ দিয়ে জাগে দিগন্তে, ন হন্যতে—
তেমনই তড়িৎ অলে ওঠো, বজ্র হও তীব্র ভাষায় এবং
আচ্ছন্ন কোটর থেকে প্রান্তরে অঝোরে বৃষ্টি দাও এখন।

বৃষ্টি চাই—
এখন চাই বৃষ্টির সুধা, যেন হীরের আলোয় দ্যুতিআলা আভরণ
নারীর, প্রপাতে মুখর। এখন এই গানে আলাপ, আর নহবত বাজুক
ভবন-দুয়ারে। কুঙ্কুমে আবীরে নৃত্যপরা পায়ের বিভায়
প্রান্তর সুময় করো,—বন্যার সৃষ্টিশীলতা এনে পলি তনিমায়,
আমাকে স্নাতক করো, স্নাত করো আনন্দে প্রাণের পৌরুষে,
লাভাময় পুলকে ঝলকে মগ্ন করো সহস্র বৃষ্টিধারার
সুখের উচ্ছলতায়, বিভাত্বিত সবুজের স্নানযাত্রায়।

দেশ আমার এমন বিপুল বিতল সৃষ্টি দাও, সূর্য দাও ;
দাও আরও বৃষ্টির কণা।—
দ্রাক্ষার মদিরা নয়, বিবদমান মক্ষিকা-ডানা নয়,
মিথ্যাভাষণের সুখে আত্মবঞ্চনাও নয়—নয়, নয়, নয়
ধাবমান অশ্বখুরে প্রদাহী ঘায়ের দিকে মুখ নয়—
শুধু বলো চরৈবেতি, চরৈবেতি : হেথা নয়, হেথা নয়
প্রান্তরে প্রান্তরে সৃষ্টিসুখের উল্লাস নিয়ে
উড়ুক তোমার বিজয়ের বৈজয়ন্তী।

স্বপ্নের দেশ আমার, এ কেমন অন্ধকারে ডুবে যাই ডুবে যাই।

(বাংলাদেশ)

চৈতন্যদেবের ভাববিপ্লব : তার তাৎপর্য ও পরিণাম

আহমদ শরীফ

সব ক্রিয়ারই কারণ থাকে, এবং একক কারণে কিছু ঘটে না ; আপাত-আকস্মিক ঘটনার পেছনেও থাকে একাধিক দৃশ্য অদৃশ্য, প্রত্যক্ষ পরোক্ষ কারণপরম্পরা। ষোলো শতকে চৈতন্যদেবের আবির্ভাবও কোনো আকস্মিক এবং স্থানিক কারণে ঘটে নি। গোটা ভারতের পটে রয়েছে এর রাজনীতিক, শাস্ত্রিক, সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক কারণসমূহ।

আজকের যন্ত্রনিয়ন্ত্রিত যুগে পৃথিবীটা মানুষের চোখের আর মনের আয়ত্তে এসে গেছে। পৃথিবীর যে-কোনো প্রান্তের ভাব আর চিন্তা, কথা আর ঘটনা, কর্ম আর আচরণ জিজ্ঞাসুর অজানা থাকে না। ফলে এখনকার কৌতূহলী মানুষের জীবনচেতনা ও জগৎভাবনা আর গৃহগত কিংবা স্থানিক সীমায় আবদ্ধ নয়। মানুষ এখন চিন্তাচেতনায় যুগগৎ এবং একাধারে স্থানের, কালের আর বিশ্বের বাসিন্দা। কিন্তু সেকালে মানুষের পরস্পরের কায়িক, মানসিক এবং বৈশ্বিক যোগাযোগে ছিল দুর্লঙ্ঘ্য বাধা। বাণিজ্যিক লেনদেনেও হত না কোনো ঘনিষ্ঠ মানসিক-সামাজিক, শাস্ত্রিক-সাংস্কৃতিক পরিচয়। এর জন্যে প্রয়োজন বিজয়ী-বিজেতার সম্পর্ক। চিন্তায়-চেতনায়, শাস্ত্রে-সমাজে, আচারে-সংস্কৃতিতে পরিচয় এবং প্রভাব হত পারস্পরিক। মানুষের মনে-মননে, শাস্ত্রে-সমাজে, কর্মে-আচরণে যুগান্তর ঘটত বিজেতার-বিজিতের, শাসক-শাসিতের দ্বন্দ্বমিলনজাত সহাবস্থানের ফলে।

৭১১ সনে একেশ্বরবাদী কাসিমপুত্র মুহম্মদের সিন্ধু-বিজয়ের ফলে জীবনচেতনায়, জগৎভাবনায় দুই বিপরীত জীবনাচারের মানুষের পরিচয়-মুহূর্ত থেকে মনে-মননে যে দ্বান্দ্বিক ভাবতরঙ্গ এদেশীয় মানুষের চিত্তলোকে অভিঘাত সৃষ্টি করল, তাতে মালাবার উপকূলের শঙ্করের মনে জ্ঞান-মায়া-অদ্বৈত তত্ত্বের এবং ক্রমে রামানুজ, নিম্বার্ক, মধ্ব, ভাস্কর প্রভৃতির চিত্তলোকে নতুন ভক্তিবাদ এবং ঈশ্বর-তত্ত্বের উন্মেষ ঘটে। এই নতুন চিন্তাচেতনাই ঘটায় প্রাচীন যুগের অবসান, এবং সূচিত করে নতুন যুগ—যার নাম আমাদের একালের পরিভাষায় 'মধ্যযুগ'। জন্ম-

জীবন-মৃত্যু সম্বন্ধে উল্লিখিত সব সস্ত-সন্ন্যাসীর নতুন উপলব্ধ তত্ত্ব প্রচারের ফলে দাক্ষিণাত্যের মানুষের শাস্ত্র-বোধে, সমাজচেতনায়, তথা জীবনাচারে এল প্রায় আমূল পরিবর্তন। এল জ্ঞানবাদ, এল ভক্তিবাদ, বৈরাগ্য, এবং শুরু হল স্বর্গ নয়,—মোক্ষ লক্ষ্যে অদ্বৈতসিদ্ধির সাধনা।

উত্তরভারতেও সবুক্তগীন-মাহমুদ-মুহম্মদ ঘোরী-কুতুব-উদ্দীন আইবকের অভিযান এবং বিজয়-সূত্রে একেশ্বর ও সামাজিক সাম্যবাদী আফগান-তুর্কীর সঙ্গে পরিচয়মুহূর্ত থেকেই দেবদ্বিজবেদের ভয়ভরসা ও শাসনশোষণনিয়ন্ত্রিত বর্ণে-বিন্যস্ত সমাজে স্পৃশ্য-অস্পৃশ্য নিম্ন নিম্নবর্ণের তথা নিম্নবৃত্তির মানুষের মনে ডানা মেলল আত্মবিকাশের এবং আত্মপ্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষার পাখি। সাদা চোখেই দেখল, আজ যে বাজার থেকে ক্রীতদাস, কাল সে জামাতা, এবং পরশু স্বপ্রতিষ্ঠ স্বাধীন সদাগর কিংবা সেনানী অথবা পদস্থ চাকুরে। দিল্লীর দুর্গে-দরবারেই দেখছে দাস হচ্ছে বাদশা। বুঝল জন্মসূত্রে বাঁধা নয় জীবন, জীবনে আত্ম-বিকাশের সম্ভাবনা অশেষ। তাই ব্রাহ্মণ্যশাস্ত্রসমাজ-মুক্তির জন্যে, স্বাধীনভাবে জীবিকা নির্বাচনের অধিকার প্রাপ্তির জন্যে, এবং সমাজে আত্মমর্যাদা নিয়ে যথাযোগ্য স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার জন্যে দেবদ্বিজদ্রোহী হল। নেতৃত্ব দিলেন 'সন্ত'নামের বৈরাগ্যপ্রবণ অদ্বৈতবাদী সাধক-সন্ন্যাসীরা, স্রষ্টার নামে আহ্বান জানালেন শাস্ত্রসমাজ-বর্জিত উদার আকাশের নীচে মুক্তাঙ্গনে। পুঁজি আর পাথেয় হল ভগবানে ভক্তি। এর নাম সন্তধর্ম। প্রবর্তক রামানন্দ, কবির, নানক, দাদূ, একনাথ, রামদাস প্রভৃতি অনেকেই। ভারতের ব্রহ্ম-সৃষ্ট এ বর্ণে-বিন্যস্ত সমাজ ছিল স্বরূপত দাস-প্রভু সমাজেরই নিরুপদ্রব বিকল্প-ব্যবস্থা। এভাবে তুর্কী প্রভাবে নতুন চিন্তাচেতনার উন্মেষে নবযুগ তথা মধ্যযুগ বাসন্তী হাওয়া নিয়ে এল উত্তরভারতের দলিত-শোষিত-অস্পৃশ্য সমাজে। যদিও হাতিয়ারের পরিবর্তন বা উৎকর্ষ না হওয়ায় জীবিকার ক্ষেত্রে আর্থিক উন্নতি লক্ষণীয় হল না। এবং নিজেরা পালক-পোষক স্রষ্টার অনুগত থেকেই ইসলামী একেশ্বরবাদের এবং সাম্যের সুফল ভোগ করতে থাকে। কাজেই ইসলামের আলাদা আবেদন থাকল না দক্ষিণ- এবং উত্তর-ভারতে।

১২০১ সনে বাঙলা জয় করলেন তুর্কী সেনানী বখতিয়ার খালজী। এখানেও ঘটল বিজিত-শাসিত জনের মনে বিচলন। তবে কিছু পার্থক্য ছিল—দক্ষিণভারতের দ্রোহী নেতারা ব্রাহ্মণ, উত্তরভারতে নেতৃত্ব দিলেন নিম্ন-বর্ণের সন্তরা। বাঙলাদেশ উত্তরভারতীয়দের কাছে অবজ্ঞেয় স্বল্পোন্নত প্রান্তিক অঞ্চল হওয়ায় এবং বিলুপ্ত বৌদ্ধজ ব্রাহ্মণ্যবাদী দিয়ে ব্রাহ্মণ্যসমাজ কৃত্রিমভাবে নব-বিন্যাসপ্রাপ্ত হওয়ায় এখানে বিচলনটা উচ্চবর্ণের মানুষকে বিশেষভাবে উদ্বিগ্ন করে তোলে। তাই শাস্ত্রসমাজকে তুর্কী-প্রভাব থেকে রক্ষা করার দায়িত্ব বর্তায় শাস্ত্রী এবং সমাজপতি ব্রাহ্মণদের উপর। তখন থেকেই তাই কেবল 'ব্রাহ্মণে-যবনে বাদ' শুরু হয়। এবং যুগ-যুগ ধরে চলে। এ হচ্ছে দুই ধর্ম-সংস্কৃতির মোল্লাপুরুতের শাস্ত্রক-আদর্শিক দ্বন্দ্ব—হিন্দু-মুসলিমের বা শাসক-শাসিতের নয়। কিন্তু শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণের বিধিনিষেধ প্রয়োজনমতে শিথিল, বর্জন কিংবা সীমিত করা সত্ত্বেও সমাজের ভাঙন রোধ করা যাচ্ছিল না, নিম্নবর্ণের তথা নিম্নবৃত্তির মানুষ শাসক-গোষ্ঠীর দরবেশদের (এ সূত্রে খ্রীস্টান মিশনারি প্রয়াস স্মর্তব্য) প্রচারে, চরিত্রবিভাস, উদারতায়, সৌজন্যে, আত্মিকশক্তির প্রভাব ও সেবায় মুগ্ধ হয়ে আত্মমর্যাদা নিয়ে স্বাধীনভাবে জীবন-জীবিকার ক্ষেত্রে আত্মশক্তির বিকাশসম্ভাবনার আশায়-আশ্বাসে ক্রমবর্ধমান সংখ্যায় ইসলাম বরণ করতে থাকে চোদ্দ-পনেরো শতক থেকে গাঁয়ে-গঞ্জে-নগরে। বাঙলাদেশেও দক্ষিণ আর উত্তর ভারতের আদলে ব্রাহ্মণ্য সমাজের ভাঙন রোধে এগিয়ে এলেন নবীন সন্ন্যাসী চৈতন্যদেব [১৪৮৬-১৫৩৩] তাঁর প্রেমবাদ নিয়ে।

চৈতন্যচরিতকারেরা তাঁর শৈশব-বাল্য-কৈশোর জীবনে অবতারসুলভ গুণ এবং আচরণ আরোপ করলেও তার ঐতিহাসিক গুরুত্ব শূন্যই। তবে পাঁচশ বছর আগেকার সমাজের এই সপ্রতিভ কিশোর গাঁয়ের এক সুন্দরীকে

ভালোবেসেছেন, নিঃসংকোচে-নির্ভয়ে সে-মেয়ে বিয়ে করার গোঁ ধরেছেন, অভিভাবককে সে-আবদার রক্ষাও করতে হয়েছে। এই সুন্দরী পত্নী ছিল জীবনপ্রেরণা। লক্ষ্মীপ্রিয়াকে অবলম্বন করেই লতিয়ে উঠেছিল তাঁর জীবনস্বপ্ন। পত্নীর মৃত্যুতে তাঁর জগৎ-জীবন যেন বৃথা হয়ে গেল।[১] এমনি অবস্থায় কেউ করে আত্মহত্যা, কেউ হয় উন্মাদ, এবং জীবনযন্ত্রণাতাড়িত অন্য অনেকে হয় সংসারধর্মে বীতরাগ বিরাগী। তখন বাঙলাদেশে গিরি, পুরী, ভারতী, আনন্দ প্রভৃতি সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসীদের আনাগোনা ছিল। জীবনযন্ত্রণা ভুলবার জন্যে বিশ্বম্ভর ঈশ্বরে আত্মসমর্পণের জন্য সন্ন্যাসী হলেন, নাম হল শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য। এমনিভাবেই মর্ত্যের নারীপ্রেম—শারীর প্রেম-ভূমার-ঈশ্বরের প্রেমে পেল পরিণতি, এবং কালের তথা স্থানিক প্রয়োজনে অবচেতনভাবেই শাস্ত্র-সমাজ-সংস্কারে হল তা নিয়োজিত। গৌরাঙ্গ রূপবান বলেই তিনি গৌরচন্দ্র-গোরাচাঁদ, গৌরাঙ্গ। বিষ্ণু-লক্ষ্মীর মনুষ্যাবতার রাধা-কৃষ্ণের প্রণয়লীলার অনুধ্যানই—হৃদয়-রূপ বৃন্দাবনে অনুভবই হল তাঁর সাধনার বিষয়। সূফী-তত্ত্বের প্রভাবে তাঁর ভগবদ্ভক্তি প্রেমবাদে হল উন্নীত।[২]

চৈতন্যদেবের আটচল্লিশ বছরের স্বল্পকালীন জীবনে শেষ বারো বছর ছিল বৈষ্ণবের ভাষায় 'দিব্যোন্মাদ'কাল। কাজেই বারো বছর মাত্র তিনি তাঁর স্বমত প্রচারের সুযোগ পেয়েছিলেন। তীর্থভ্রমণে, দেশপর্যটনেও কেটেছে কিছুকাল। বাঙলাদেশেও তাঁর এ সময়ে অবস্থিতি ছিল স্বল্পকালের। রাজনীতিক কারণে রাজরোষের আশঙ্কায় নদীয়া ছেড়ে তাঁকে উড়িষ্যার নীলাচলে, হিন্দুরাজ্য পুরীতে আশ্রিত হতে হয়েছিল। শাস্ত্রসমাজপ্রেমী হিন্দু জাগরণবাদী সংস্কারকরা হিন্দুমনে উদ্দীপনা এবং সাহস সঞ্চারের জন্যে এক 'ভবিতব্য' রটিয়ে দিয়েছিল যে 'গৌড়ে ব্রাহ্মণরাজা হবে হেন আছে'। সুলতান এ রটনায় শঙ্কিত ও সতর্ক হয়ে নাকি সৈন্য সমাবেশ করেন নদীয়ায়। চৈতন্যদেব সানুচর পথে-পথে পদযাত্রায় গীত-বাদ্য-নৃত্যযোগে কৃষ্ণলীলা-কীর্তন-মাধ্যমে তাঁর নব প্রেমবাদ প্রচার করতে থাকেন। প্রতিবেশী সনাতন শাস্ত্রপন্থীরা একে স্বধর্মবিরোধী অনাচার মনে করে চৈতন্যকে বিরত করার জন্যে নদীয়ার কাজীর কাছে অভিযোগ করে। কাজী চৈতন্যের সংকীর্তনযাত্রা নিষিদ্ধ করে দেন। কিন্তু গৌড়-সুলতান গৌড়ে ব্রাহ্মণরাজত্বকামী হিন্দু সমাজে বিভেদ-বিরোধ সৃষ্টির লক্ষ্যে চৈতন্যদেবকে সংকীর্তনে এবং স্বমতপ্রচারে উৎসাহ দেয়ার গোপন নির্দেশ দেন। তবে কিছুকালের মধ্যেই চৈতন্যদেবের জনপ্রিয়তা এবং অনুগতের সংখ্যা অভাবিত ভাবে বৃদ্ধি পাওয়ায় সুলতান এঁর হাতেই রাজ্য হারানোর আশঙ্কায় উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠেন, এবং কোনো ব্যবস্থা গ্রহণের পূর্বেই দরবারের চৈতন্য-অনুরাগী দবীর খাস ও সাকের মল্লিক রূপ-সনাতনের[৩] পরামর্শে চৈতন্যদেব গৌড় ছেড়ে চলে যান। এর ফলে বাঙলাদেশে চৈতন্যদেবের নব গৌড়ীয় বৈষ্ণব মত আশানুরূপ প্রসার লাভ করে নি। অদ্বৈত-নিত্যানন্দ এবং বৃন্দাবনের রূপ-সনাতন-জীব প্রমুখ ষড়্‌গোস্বামীর প্রভাবও মোটামুটিভাবে পশ্চিমবঙ্গেই ছিল সীমিত। চৈতন্যদেবের দিব্যোন্মাদকালেই চৈতন্যতত্ত্ব নিয়ে অদ্বৈতাচার্যের আর নিত্যানন্দের দলে মতভেদ দেখা দেয়। অদ্বৈতাচার্যের দল যেমন চৈতন্যকে রাধাকৃষ্ণের যুগলাবতার ভাবতে শুরু করে তেমনি নিত্যানন্দের দলও চৈতন্যকে বৌদ্ধ বজ্রসহজযানের প্রবক্তা বলে বিশ্বাস করতে থাকে। প্রথমটির নাম গৌরপারম্যবাদ এবং দ্বিতীয়টির নাম গৌরনাগরবাদ। এ শেষোক্তটি থেকে সহজিয়া বৈষ্ণব মতের উদ্ভব আর প্রসার ঘটে।

চৈতন্যদেবের লিখিত কোনো বাণী বা 'দেশনা' নেই। 'শিক্ষাষ্টক' নামে কেবল আটটি সাধন-ভজন (সংকীর্তন, নামজপ, ভক্তি, বিনয় প্রভৃতি)-সম্পৃক্ত সংস্কৃত শ্লোক তাঁর রচিত বলে বিশ্বাস করা হয়। তাঁর উচ্চারিত কথা 'চণ্ডালোঽপি দ্বিজশ্রেষ্ঠ হরিভক্তিপরায়ণঃ' কিংবা মুই সেই মুই সেই [সোঽহম্‌-তত্ত্ববাচক]। আর তাঁর জীবনে যা বাস্তবায়িত হয়েছে তা হল রাধাভাবে কৃষ্ণারাধনা :

> প্রেমের পরমসার মহাভাব জানি
> সেই মহাভাবরূপ রাধা ঠাকুরানী।
> সেই মহাঠাকুরানীভাব যার মনে উপজয়
> বেদধর্ম তেজি সে কৃষ্ণকে ভজয়।
> রাধাকৃষ্ণ এক আত্মা দুই দেহ ধরি
> অন্যোন্যে বিলসয় রাসাস্বাদন করি।

বৈষ্ণব তাত্ত্বিকদের মতে, চৈতন্যদেব 'নরে নারায়ণ' ও 'জীবে ব্রহ্ম দর্শন' করেছিলেন, অর্থাৎ অচিন্ত্যাদ্বৈতাদ্বৈততত্ত্ববাদী চৈতন্যদেব নরে-জীবে সর্বত্র ব্রহ্মেরই প্রমূর্ত কিংবা বিমূর্ত রূপ-স্বরূপ, প্রকাশ-বিকাশ অনুভব-উপলব্ধি করতেন। 'অনন্ত স্ফটিকে যৈছে এক সূর্য ভাসে।/ তৈছে জীবে গোবিন্দের অংশ প্রকাশে'। এ অনুভব-উপলব্ধিই তাঁকে মানবসাম্যে, মানবপ্রেমে, নির্বিশেষ প্রীতিতত্ত্বে, অহং-বিনাশী বিনয়ানুশীলনে আস্থাবান করেছিল, আর সূফীতত্ত্বের প্রভাবে ভক্ত-ভগবানের সম্বন্ধে যে দাস-প্রভুর নয়—প্রেম-প্রীতি-সখ্যের—তাও হয়েছিল তাঁর বোধগত।

> সখীভাবে পায় রাধা-কৃষ্ণের চরণ
> সেই গোপীভাবমতে যার লোভ হয়
> বেদধর্ম তেজি সে কৃষ্ণকে ভজয়।

কৃষ্ণরূপ সে নারায়ণের গোপীভাবে তথা সখা-সহচররূপে কৃপা-করুণা-ক্ষমা-প্রীতি-প্রসন্নদৃষ্টি লাভের সাধনাই যে শ্রেষ্ঠ মনুষ্যসাধনা, তা হয়েছিল উপলব্ধ। তাই 'রাধা-কৃষ্ণনাম' জপ আর সংগীত-মাধ্যমে তাঁদের প্রণয়লীলা কীর্তনই হল সাধন-ভজনপন্থা। সূফী প্রভাবে অন্যদের মতো বৈদান্তিক অদ্বৈততত্ত্বকে সূক্ষ্মতর চেতনায় লব্ধ অচিন্ত্যাদ্বৈতাদ্বৈত[৪]স্বরূপে উপলব্ধি করা এবং ভক্তিকে প্রেমে উন্নীত করাই ছিল এদেশের—ভারতবর্ষের—ধর্ম-দর্শনে ও দার্শনিক তত্ত্বভাবনায় চৈতন্যদেবের সর্বশ্রেষ্ঠ দান। এ দুই তত্ত্ব অবলম্বন করেই রূপ-সনাতনজীব প্রমুখ ষড়্‌গোস্বামী নানা টীকা-ভাষ্য-ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ-মাধ্যমে বৈষ্ণবের সাধ্যসাধনাতত্ত্ব 'উজ্জ্বলনীলমণি' প্রভৃতি গ্রন্থে, ব্রজমোহন দাস 'চৈতন্যতত্ত্বপ্রদীপে' এবং কৃষ্ণদাস কবিরাজ 'চৈতন্যচরিতামৃত' নামের চৈতন্য-প্রোক্ত দার্শনিক তত্ত্বকাব্যে নিরূপণ করেছেন। বৈষ্ণবের দ্বাদশতত্ত্ব-রসতত্ত্ব এবং সহজিয়া সাধনতত্ত্বও উক্ত সব টীকাভাষ্যেরই প্রসূন।

যদিও শাস্ত্র-সমাজসংস্কারক রূপেই চৈতন্যদেবের আপাত আবির্ভাব ঘটেছিল, পরিণামে তিনি দেব-দ্বিজ-শ্রুতি-স্মৃতি-গীতা-বিরোধী নতুন অচিন্ত্য দ্বৈতাদ্বৈত-তত্ত্বভিত্তিক ভগবৎ-প্রেমবাদ প্রচার করেন। যেহেতু রাধা-কৃষ্ণনামসম্বল এ মতবাদ, সেহেতু নবগৌড়ীয় বৈষ্ণব-মতবাদ রূপে তা ব্রাহ্মণ্য শাস্ত্রের এবং সমাজের উপমত-রূপে স্বীকৃতি পেল।

রূপে অসামান্য, গুণে অনন্য এ তরুণ সন্ন্যাসীর ব্যক্তিত্বের প্রভা এবং প্রভাব অনুপস্থিতি সত্ত্বেও লঘু-গুরুভাবে পরিব্যাপ্ত হয়েছিল দেশের সর্বত্র। তাঁর পার্ষদ-পরিকরেরা নিজেদের জীবনে বিনয়, সাম্যচেতনা, মানব-প্রীতি, সততা আর বৈরাগ্যকে বাস্তব রূপ দিয়েছিলেন। বলেছি—বৈষ্ণব মত খুব কম লোকেই বরণ করেছিল, কিন্তু বৈষ্ণবের জীবনাচারের, সংস্কৃতির এবং জীবনভাবনার প্রভাব গভীরভাবে পড়েছিল বাঙলার হিন্দু-মুসলিম-নির্বিশেষের উপর। তাই ব্যক্তিমানুষের মর্যাদা, স্বাতন্ত্র্য-চেতনা, সহিষ্ণুতা, বিনয়বোধ, সংবেদনশীলতা, প্রীতি-কামিতা, জীবাত্মা-পরমাত্মার নৈকট্য ও অভিন্নতাবোধ প্রভৃতি অচেতনভাবেই সঞ্চারিত হয়েছিল সংবেদনশীল ভাবপ্রবণ হিন্দু-মুসলিমের চিত্তে। 'রাধা ছাড়া সাধা নেই, কানু ছাড়া গীত নেই',—এমনি নবসৃষ্ট প্রতিবেশেরই দান। তা ছাড়া, চৈতন্যভাবান্দোলনের প্রভাবে হিন্দু-মুসলিম মোটামুটি ১৫২০ থেকে ১৫৮০ সন অবধি রামায়ণ-মহাভারত কিংবা মঙ্গল-পাঁচালী রচনায়ও হয়ে পড়েছিল উদাসীন। এ সময়ে রচিত প্রণয়কাব্যে এবং পরবর্তী কালে রচিত রামায়ণ-মহাভারত-ভাগবত ও মঙ্গল-পাঁচালীতে চৈতন্যের প্রেমধর্মের প্রভাব উদারতায়

সহিষ্ণুতায় কৃপায় করুণায় ক্ষমায় ও প্রীতিপ্রসন্নতায় সুপ্রকট, যদিও বৈষ্ণব সাধনানুগ তথা রাগাত্মিক ও রাগানুগ রাধা-কৃষ্ণপ্রণয়গীতি এখনকার প্রেসিডেন্সি আর বর্ধমান বিভাগের বাইরে রচিত হয় নি, তবু রাধা-কৃষ্ণরূপকে চট্টগ্রাম অবধি সর্বত্র হিন্দু-মুসলিম পদকাররা দেহাত্মতত্ত্বের অধ্যাত্মসংগীত রচনা করেছেন বৈষ্ণব প্রভাবেই। বাঙালি মহত্তর জগৎচেতনায় এবং জীবন-ভাবনায় উদ্বুদ্ধ হয়েছিল, এ কারণেই আমরা চৈতন্য-প্রভাবিত ষোলো শতককে বাঙলার ভাববিপ্লব বা রেনেসাঁস যুগ বলে আখ্যাত করতে চাই।

চৈতন্যচেতনা অবশ্য ঐহিকতাবিরোধী বৈরাগ্যপ্রবণ আকাশচারিতা। অধ্যাত্মচেতনা প্রবল হলে ঐহিক জীবন-চেতনা নিষ্ক্রিয় হয়ে যায়। তাতে ঐহিক জীবনের বৈষয়িক দায়িত্ব-কর্তব্য হয় অবহেলিত। ফলে রাষ্ট্রিক-আর্থিক-সামাজিক জীবনে দেখা দেয় গতানুগতিকতা, চিন্তা-চেতনায় আসে বদ্ধতা, আবিষ্কারে-উদ্ভাবনে থাকে না আগ্রহ। ফলে মনে-মননে-শাস্ত্রে-সমাজে-সংস্কৃতিতে শীত-গ্রীষ্মের বহুব্যবহৃত ক্ষুদ্র জলাশয়ের জলের মতো দেখা দেয় বিকৃতি আর অবক্ষয়।

চৈতন্যতিরোভাবোত্তর অল্প কালের মধ্যেই বৈষ্ণব সমাজে তত্ত্বভেদজাত মতভেদ, রক্ষণশীলতা, কর্মকুণ্ঠা, ভিক্ষাজীবিতা, দ্বেষ-দ্বন্দ্বপ্রবণতা, আভিজাত্যচেতনা, অবিনয়-অসাম্য-অপ্রীতি-অহংবোধ প্রবল হতে থাকে। যিনি আচণ্ডাল যবনে কোল দিয়েছিলেন, যবন হরিদাসের এঁটো খেয়েছিলেন, সুবুদ্ধি রায়কে এবং স্খলিত চরিত্রের বিধবা নারায়ণীকে আর তাঁর সন্তানকে সাদরে সসম্মানে সমাজে ঠাঁই দিয়েছিলেন, অহং-আভিজাত্য-বিনাশলক্ষ্যে ও বিনয়ে কুলবাচি পরিহারে, নর বা জীব সেবক 'দাস' নাম গ্রহণে, বর্ণ বা জাতিভেদ বর্জনে, প্রীতিসূত্রে দাম্পত্য জীবন বরণে, নরে নারায়ণ-জীবে ব্রহ্মদর্শনে অনুপ্রাণিত করেছিলেন পার্ষদ-পরিকরদের মানুষের জন্যে বৃহত্তর মিলন-ময়দান তৈরির লক্ষ্যে, পরিণামে তাঁর সেই অনুগামীরাই দ্বেষ-দ্বন্দ্বের-ব্যবধানের দেওয়াল তুলে একটি নতুন খণ্ড ও ক্ষুদ্র সম্প্রদায় সৃষ্টি করল মাত্র।

চৈতন্যচরিতকারগণ এবং চৈতন্যমতবাদের ভাষ্যকার-গণ স্ব-স্ব জাত-বর্ণ-গোত্র-আচারের বিশুদ্ধতা এবং মূল্যমর্যাদা রক্ষার উদ্দেশ্যে অস্পৃশ্যদ্বেষী জাতিভেদপ্রথার সমর্থক ব্রাহ্মণ্য আচারনিষ্ঠ শুচিবাইগ্রস্ত ব্যক্তি হিসেবে অঙ্কিত করেছেন চৈতন্যদেবকে[৫] এবং এভাবে বর্ণে-বিন্যস্ত স্থিতিশীল বা স্থাবর বৈষ্ণব সমাজ নতুনভাবে গড়ে তুলেছেন—শাস্ত্রিক, বৈবাহিক, সামাজিক ও আচারিক জীবনে তথাকথিত বিশুদ্ধতার দোহাই দিয়ে। এভাবে চৈতন্য-অভিপ্রেত বৈষ্ণবের মন-মননের মহা-সামুদ্রিক প্রবাহ তাঁরা সরু-সংকীর্ণ খাতে বহমান রাখলেন কায়েমি সংকীর্ণ স্বার্থে। এখানেই শেষ নয়—কেবল শৈব-শাক্ত পাপী-পাষণ্ডদের শিরে লাথি মেরেই তারা ক্ষান্ত হয় নি [এতো পরিহারেও যে পাপী নিন্দা করে। লাথি মারোঁ তার শিরের উপরে।—বৃন্দাবন দাস] অসহিষ্ণু ও ক্ষুব্ধ-বিদ্বিষ্টমনে 'যবন', 'ম্লেচ্ছ' শাসক-গোষ্ঠীর প্রতি কিছু নিন্দা-অপবাদ উচ্চারণ করে শাসিতসুলভ মনের ঝাল মিটিয়েছেন তাঁদের রচনায়। শাসকগোষ্ঠীও তখন পরম উদারতায় তা সহ্য করেছেন।

তথ্যনির্দেশ

১। দীনেশচন্দ্র সেনও বলেছেন, 'লক্ষ্মীর অপঘাত-মৃত্যুই চৈতন্যদেবের সংসারবৈরাগ্যের অন্যতম কারণ'। বঙ্গভাষা ও সাহিত্য, ৮ম সং, পৃ ১৭২, পাদটীকা। জয়া-নন্দ বলেছেন, সর্পাঘাতে লক্ষ্মীপ্রিয়ার মৃত্যু হয়। অবৈষ্ণব সমাজে চালু কিংবদন্তী অনুসারে শাশুড়ি শচীদেবীর নির্যাতন অসহ্য হওয়ায় বধূ আত্মহত্যা করেন। 'শাশুড়ী সাপিনী ননদী বাঘিনী'—এ আপ্তবাক্যাংশই কি সর্পদংশন বলে কবি সাংকেতিক বা প্রতীকী অর্থে ব্যবহার করেছেন!

২। ডক্টর তাঁরাচাদ, বিনয় ঘোষ, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণ, উমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য, সুকুমার সেন প্রমুখ সবাই সন্তধর্মে এবং নব গৌড়ীয় বৈষ্ণব মতবাদে ইসলামের ও সূফীমতের প্রভাব স্বীকার করেন। এখানে ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক -ব্যাখ্যাত প্রভাবের রূপ-স্বরূপ উদ্ধৃত করছি :—'নামে রুচি, জীবে দয়া'—ইহাই গৌড়ীয় বৈষ্ণবমতের মূলশাস্ত্র।......গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের এই 'নামে রুচি ও জীবে দয়া' মুসলিম সূফী সাধকদের 'জিকর' ও 'খিদমৎ' নীতির নামান্তর। ইহাতে ইসলামের সাম্য, উদারতা ও ভ্রাতৃত্বের ছাপও সুস্পষ্ট। সূফীদের 'সমা' বৈষ্ণবদের 'কীর্তনে' কোন তফাৎ নাই। এই কীর্তনের শেষে বৈষ্ণবদের যে দশা হয়, তাহাতে শারীরিক ও মানসিক অবস্থা ফুটিয়া উঠে, সূফীদের 'হালের' অবস্থাও তাহাই। কীর্তন ও সমা, এবং দশা ও হাল শব্দার্থ, ভাব, সম্পাদন-ব্যবস্থা ও মানসিক অনুভূতির দিক হইতে একই বস্তুর অভিব্যক্তি। গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের প্রেম সূফীদের 'ইশক'। রাধা-কৃষ্ণ সূফীদের 'সাকী' ও বুাৎ কিংবা শারআ ও পরওয়ানা'। ঐশ্বর্য 'সূফীদের কিয়ামৎ' ছাড়া আর কিছুই নহে।" [মুসলিম বাঙ্গালী সাহিত্য, ১ম সং, ১৯৫৫ সন, পৃ ৫০-৫১।]

৩। দুই ভাইয়ের রূপ ও সনাতন নাম চৈতন্যদেব-প্রদত্ত। 'রূপ-সনাতন নাম থুইল দোহার'—চৈতন্যতত্ত্ব-প্রদীপ—ব্রজমোহন দাস, এবং 'দুই ভাইয়ের নাম হইল রূপ-সনাতন'—জয়ানন্দ।

৪। ইসলামের প্রভাবেই ভাস্কর ভেদাভেদবাদী, রামানুজ বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী, নিম্বার্ক দ্বৈতাদ্বৈতবাদী, মধ্ব দ্বৈতবাদী, বল্লভ শুদ্ধাদ্বৈতবাদী হন।

৫। বৃন্দাবন দাস-প্রমুখ রচিত চরিতগ্রন্থে ব্রাহ্মণের বাড়িতে আশ্রয় ও অন্ন গ্রহণ প্রভৃতির বর্ণনা রয়েছে। ডক্টর সুশীলকুমার দে তাঁর 'দ্য বৈষ্ণব ফেথ অ্যানডমুভমেনট' গ্রন্থে চৈতন্যদেব 'জাতিভেদ'প্রথার সমর্থক বলে উল্লেখ করেছেন।

এ প্রবন্ধে পরিব্যক্ত প্রায় সব 'মত ও মন্তব্য' তথ্য-ভিত্তিক। বিস্তৃত আলোচনা মৎ-প্রণীত 'বাঙালী ও বাঙলা সাহিত্য' (২য় খণ্ড) গ্রন্থে দ্রষ্টব্য।

পাঠকদের প্রতি নিবেদন

'চতুরঙ্গ' মেশিনে-ঢালা টাইপে (লাইনোটাইপে) ছাপা হয়ে থাকে। কিন্তু আয়ত্তের অতীত কারণে বর্তমান সংখ্যায় আমরা হাতে-গাঁথা টাইপ ব্যবহার করতে বাধ্য হয়েছি। আশা করি পাঠকসমাজ এবং শুভানুধ্যায়ীরা এই অনিচ্ছাকৃত বিচ্যুতির জন্য মার্জনা করবেন।

—সম্পাদক

অলীক মানুষ

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ

নয়

...স্পষ্ট মনে পড়ে দিনটিকে। মেঘে ঢাকা আশ্বিনের আকাশ থেকে টিপটিপিয়ে বৃষ্টি ঝরছিল। প্রফুল্লবাবু গম্ভীর মুখে বলছিলেন, সেবারকার মতো পাগলি ক্ষেপে না ওঠে; এবং একটু পরেই বুঝতে পেরেছিলাম, পাগলি বলতে তিনি কাছারিবাড়ির পেছনের নদীটিকেই চিহ্নিত করছেন। তারপর প্রফুল্লবাবু যখন ক-বছর আগে কাছারিবাড়িতে বন্যার জল ঢোকার বর্ণনা দিচ্ছিলেন, তখন অবাক লেগেছিল. ওই শীর্ণ বেহুলা নামের স্রোতস্বিনী, যাকে এখন এই শরৎকালে বেহালার টানটান তারের মতো দেখায়—যেন ছুঁলেই টুং করে বেজে উঠবে, সে কেমন করে সব-ভাসানিয়া স্বভাব আর সাহস পায়? আর কাল্লু আমাকে বলেছিল, চত্তির মাহিনামে তাকে দেখলে তাজ্জব হোয়ে যাবেন ছোটাসাব! জেরাসে—এত্তোটুকুন ভি পানি না আছে। বহত্ বালি—খালি বালি! ঔর উও বালি চক্কর মারতে-মারতে হাওয়া কি সাথ পাগলা জিনকি মাফিক্ কাছারিমে ঘুসবে! আঁখ অন্ধা কোরবে! তো ছোটাসাব, বেহুলা এইসি নদীয়া আছে! বহত খেয়ালওয়ালি আছে!

নদীর দিকে কখনও আলাদা করে তাকাতে জানতাম না তখনও। তখনও কি জানতাম আলাদা করে কিছু—ওটা গাছ, এটা মাঠ, ওটা আকাশ, এটা কাশবন? উলুশরার মাঠে সারবাঁধা গাড়ির পেছনে নিজেকে একলা করে নিয়ে হেঁটে আসতে-আসতে সেই যে একটা অবচেতনা গড়ে উঠেছিল—যার মধ্যে যাধীনতা আছে, যা প্রকৃতি, তাই যেন কাল্লু পাঠানের সঙ্গে কয়েকটি দিনের ভ্রমণে পাগলি বেহুলার মতো টানটান বয়ে যেতে চের পেতাম। কুঠিবাড়ির জঙ্গলে, ওপারে মেহরুর কুঁড়েঘরের সামনে দাঁড়ানো গারগাছের ছায়ায় মাচানে বসে এক আদিম পৃথিবীর গল্প শুনতে-শুনতে একটি পরাবাস্তবতা আমাকে আবিষ্ট করত। বড়ো যাধীনতাময় সেই পরাবাস্তবতা, যার সঙ্গে মৌলাহাটের একটি মেয়ের নিবিড় সম্পর্ক আছে। হুঁ, রুকু ছিল সেই যাধীনতাময় পরাবাস্তবতার দূরতম প্রান্তে দাঁড়ানো। মাঝে-মাঝে বেহুলা আর রুকু এক হয়ে যেত! কিন্তু বারিচাচাজির সতর্ক প্রহরীর মতো সাতমার কাল্লু খাঁ যেন আমার চারদিকে কী এক দুর্ভেদ্য বৃহ গড়ে তুলেছিল! তাই তাকে ঘৃণা করতাম। অথচ তার মধ্যে বিস্ময়কর বহু চুম্বক ছিল—তাকে এড়ানো যেত না।

তো মেঘঢাকা দুর্লক্ষুনে টিপটিপ বৃষ্টির দিনে ভিজে জবুথবু হয়ে যে-ঘোড়সওয়ার কাছারিবাড়ির ফটক দিয়ে ঢুকছিল, প্রথমে তাকে জানালা দিয়ে আমিই দেখতে পাই। তিনিই যে হরিণমারার বড়োগাজি সইদুর রহমান, একেবারে চিনতে পারি নি। তাঁর পরনে ছিল আলিগড়ি চুস্ত পাজামা আর শাদা নকশাদার পানজাবি, মাথায় তুর্কি টুপি। ওপরের হলঘরে যখন তাঁকে সসম্মানে নিয়ে আসা হল, তখন তাঁর নেতিয়েপড়া কাদাটে মূর্তি দেখে হাসি পাচ্ছিল। কারণ কিছুদিন আগেই এই লোকটিকেই সবিক্রমে তলোয়ার সঞ্চালন করতে দেখেছি! কিন্তু তখনও জানতাম না, তিনি কেন হঠাৎ এই দুর্যোগে এতদূর পাড়ি জমিয়েছেন? আর ওই কাদাটে চেহারায় তাঁকে এতটুকু ক্লান্ত বা ম্রিয়মাণ দেখাল না এবং তিনি প্রথমেই সোজা এসে আমার সামনে দাঁড়ালেন। ভিজে ঠাণ্ডা হাতে আমার একটা হাত চেপে ধরে প্রচণ্ড উল্লাসে একটি ইংরেজি বাক্য উচ্চারণ করলেন, মাই বয়! নাও ইউ আর ফ্রি!

বারি মিয়াঁ অবাক হয়ে বলেছিল, ফি ফ্রম হোয়াট, গাজি?

ফ্রম ডেনজার! বড়োগাজি এত জোরে অট্টহাসি হাসলেন যে সেই মুহূর্তের শরৎকালীন মেঘগর্জনও খান-খান হয়ে গেল। বড়োগাজি বলেছিলেন ফের, ফ্রি ফ্রম ডেনজার! মৌলানা বদিউজ্জামানের বড়ো এবং মেজো ছেলের সঙ্গে আমার বন্ধু লেট তোফাজ্জেল চৌধুরির দুই মেয়ের শাদি হয়ে গেছে গতকাল।

প্রফুল্লবাবু হেসে ফেলেছিলেন বড়োগাজির অঙ্গভঙ্গি দেখে। কিন্তু বারিচাচাজি হাসছিলেন না। সেই মেঘগর্জন ছিল বজ্রপাতঘটিত এবং আমার মনে হয়েছিল বাজটি আমার ওপর পড়েছে। রুকু! আমার রুকু! তাকে পাশে নিয়ে শোবে মনিভাই—অর্ধগণ্ড অর্ধমানব, বিকলাঙ্গ, উদ্ভট একটা প্রাণী! অকপটে বলছি, ওকে কতদিন আবছা-আঁধার ঘরে উচ্ছ্রিত শিশ্ন নিয়ে জঘন্য খেলায় লিপ্ত দেখেছি এবং সে-কথা এই বিশাল পৃথিবীর কোনো বৃক্ষকেও জানাতে পারতাম না। এখন নিশ্চিত মৃত্যুর সামনে দাঁড়িয়ে আছি বলেই জানিয়ে যেতে চাইছি। এ মুহূর্তে জীবনের—আমার এই দণ্ডিত জীবনের পুরোটাই আমি পটের মতো ছড়িয়ে দিতে চাই—মাড়িয়ে যেতে ইচ্ছে হলে তুমিও পা বাড়াতে পার লম্বানেকো শাশ্বীভাই!...

একটু পরে বারি চৌধুরি আস্তে বলেছিলেন, গাজি, তুমি কী বলছ!

বড়োগাজি হাসতে-হাসতে বলেছিলেন, শাদিতে আমারও জেয়াকত (নেমন্তন্ন) ছিল চৌধুরি! মইদুর মানে তোমাদের ছোটোগাজিরও ছিল। অবশ্য আমি মদুর মতো পিরশায়েরের মুরিদ হই নি। কারণ তাহলে আমাকে ব্র্যানডি-হুইসকি ছাড়তে হবে। সিগারেট ছাড়তে হবে। পাঁচ অক্ত নমাজ পড়তে হবে। ইসলামের জন্য এতখানি স্যাক্রিফাইস করতে আমি রাজি নই ভাই! আমাকে জেয়াকত করেছিল আমার লেট বুজম ফ্রেনড তোফাজ্জলের বউ। চৌধুরি, শি ইজ এ জিনিয়াস! ইলিটারেট চাষাভুষোর মেয়ে হতে পারে, কিন্তু তার অসামান্য শক্তি। শক্তি আর জেদ। আমি ওর প্রশংসা করি!

কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর বারি চৌধুরী একই ভাবে বলেছিলেন, আমি করি না।

কেন বলো তো?

আজও জানি না, সেদিনও বুঝতে পারি নি, কেন বড়োগাজির ওই সরল প্রশ্ন শুনে বারিচাচাজি হঠাৎ ফেটে পড়েছিলেন। আই হেট দ্যাট উওম্যান। ছোটো-

লোকের মেয়ে! তরতাজা গোলাপের মতো ফুটফুটে একটা মেয়েকে—

উত্তেজনায় বাকরুদ্ধ দেওয়ানসাহেব উঠে গিয়ে জানালার রড মুঠোয় আঁকড়ে পাথরের মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে ছিলেন। বড়োগাজি একটু হকচকিয়ে গিয়েছিলেন প্রথমে। সামলে নিয়ে শুকনো হেসে বলেছিলেন, সিদ্দিদা! আপনার দেওয়ানসাহেবকে আজ অব্দি আমি বুঝতে পারলাম না! এলাম ঝড়পানি মাথায় করে এত ক্রোশ পথ একটা সুখবর দিতে! আর মিয়াঁসাহেব উলটে—থাক গে, বকক গে! আমি চলি।

বুঝতে পেরেছিলাম বড়োগাজি অপমানবোধে আহত। প্রফুল্লবাবু হাঁ-হাঁ করে উঠেছিলেন, কী মুশকিল! কাপড়-চোপড় বদলে নিন। অনুগ্রহ করে গরিবালয়ে এসে পড়েছেন যখন, তখন এভাবে চলে গেলে গেরস্থের অকল্যাণ হয় জানেন না?

প্রফুল্লবাবুর কথার মধ্যে সরলতা আর কৌতুকও ছিল। কিন্তু বড়োগাজি গ্রাহ্য করেন নি। আমার দিকে ঘুরে বলেছিলেন, তোমার কাছে তলব পাঠিয়েছিলেন তোমার আব্বা—কিংবা আম্মা। যাই হোক, কাজি-সাহেব কিছু বলতে পারেন নি তুমি কোথায় আছ। আমি অবশ্য বলেছিলাম লোকটাকে সোজা এখানে আসতে। আসে নি সে?

খুব আস্তে বলেছিলাম, না। একটু পরেই ফের বলেছিলাম, জানি না।

আমার হাতে ঠাণ্ডাহিম হাত রেখে বড়োগাজি বলেছিলেন, যাক গে। যা হয়, ভালোর জন্যই হয়। তুমি বেঁচে গেছ। এখন মন দিয়ে পড়াশুনো করো। ওহে চৌধুরি! তোমার আবার হলটা কী? ঘোরো এদিকে। আহা!

বলো!

শফি হরিণমারায় ফিরছে কবে?

কেন?

অদ্ভুত প্রশ্ন! বড়োগাজি একটু বিরক্ত হয়ে বলেছিলেন। ওকে কি স্কুল ছাড়িয়ে দেবে নাকি? মাথা ঠাণ্ডা রেখে আমার কথাটা শোনো। পুজোর ছুটি চলছে এখন। দিনকতক এখানে থাক। তারপর আমার কাছে এসো। কাজির বাড়ি থাকলে ওর লেখাপড়া হবে না। কাজির ছেলেটা বড্ড শয়তান! শফিকে আমি রাখব। আমার বাড়ি থাকবে। আমি ওকে পড়াব। ইংরেজিতে ও বড্ড কাঁচা—জান কি?

বারি চৌধুরি চাপা শ্বাস ছেড়ে সরে এসেছিলেন জানালা থেকে।—সেসব কথা পরে হবে। তুমি যেও না। পোশাক বদলে নাও। খাওয়া-দাওয়া করো!

বড়োগাজি পা বাড়িয়ে বলেছিলেন, তোমার মাথা খারাপ? আসার পথে রফিকুল আমাকে দেখেছে। ওর বউ এতক্ষণ গোঁসা করে বসে আছে।

বলে সিঁড়িতে নেমে একবার ঘুরে ফের বলে গিয়েছিলেন, এতক্ষণ মোরগ হালাল করে ফেলেছে, খোদার কসম!

আমি উত্তরের জানালার ধারে বসে বেহুলাকে দেখছিলাম। দেখতে পাচ্ছিলাম, আঁকাবাঁকা বৃষ্টিকে তার ভেতর গাঢ় ও বিস্তীর্ণশ্যামলতাকে—যা স্বাধীনতাময়। সেই স্বাধীনতাকে ধূসর আলো ও আবহমণ্ডলের মধ্যে আলোড়িত একটি ব্যাপকতার মতো বোধ হচ্ছিল! যেন হাত বাড়ালেই এখন তাকে ছুঁতে পারব। ভেসে যেতে পারব সেই প্রাকৃতিক স্বাধীনতাস্রোতে। আমি এবার কী স্বাধীন! কী স্বাধীন! আমি তো এখন যা খুশি করতে পারি! আমি 'ফি'—স্বাধীন মানুষ!

প্রফুল্লবাবু চলে গেলে বারিচাচাজি আমার কাছে এলেন। আমার চুবাঁধ ধরলেন। পিঠে তাঁর শরীরের উষ্ণ স্পর্শ। আস্তে বললেন, আমাকে ভুল বুঝিস নে বাবা! ঠিক এমনটি আমি চাই নি! আমার বুক ভেঙে যাচ্ছে রে, শফি! এ কী ঘটল, বুঝতে পারছি না! আমারও বড়ো ইচ্ছে ছিল, রুকুর সঙ্গে তোর শাদি হোক। আমি জানি—আমি সব জানি রে!

কী জানেন? এই প্রশ্নটা আমার গলার ভেতর

আটকে গেল। জিভ তাকে তুলে ধরতে পারল না। দুই ঠোঁট তাকে বের হতে দিল না। শুধু ঘুরে বারিচাচাজির দিকে তাকালাম। দেখলাম, ওঁর চোখ দুটো ভিজে যাচ্ছে। কাঁপা-কাঁপা স্বরে ফের বললেন, এমন ফুলের মতো সুন্দর মেয়েটাকে হাবাগোবা জড়বুদ্ধি আর বিকলাঙ্গ একটা ছেলের হাতে তুলে দিতে বাধল না হারামজাদির! ওকে গুলি করে মারতে ইচ্ছে হচ্ছে। কিন্তু মেরেও তো আর—

চাচাজি!

আমার ডাক শুনে বারিচাচাজি থেমে গিয়েছিলেন। কিন্তু কেন হঠাৎ আমি ডেকে ফেললাম কে জানে! কী বলতে চাইলাম তাঁকে, মুহূর্তেই ভুলে গেলাম। উনি আমার দুই কাঁধে চাপ দিয়ে বললেন, ছেড়ে দে। গাজি হয়তো ঠিকই বলে গেল, যা হয় ভালোর জন্যই হয়। মন দিয়ে পড়াশোনা কর। মন খারাপ করিস নে বাবা! দুনিয়াটাই এরকম। মানুষ যেন এক অদৃশ্য হাতের পুতুল! তার নিজের ইচ্ছের কোনো মূল্য নেই!

সেদিন ধূসর ভিজে আবহমণ্ডলে এইসব কথা আর ঘটনা অমনই ধূসর আর ভিজে হয়ে উঠেছিল। মনে হচ্ছিল বিশাল এক লোকসংগীত শুনছি চারদিকে। ইচ্ছে করছিল সবকিছুতে লাথি মারি। গুঁড়িয়ে ফেলি সাজানো নবাবি ঘরের আসবাবপত্তর। ছুটে বেরিয়ে যাই একটা কালোরঙের ঘোড়ার পিঠেচেপে—ছুটতেই থাকি ক্রমাগত, দিনভর রাতভর—আমৃত্যু। রুকু! আমার রুকু! রুকু তো আমারই। আমার জন্যই নির্দিষ্ট ছিল রুকু। সেই রুকুকে হাত থেকে কেড়ে নিল আমারই এক সহোদর ভাই, অর্ধগত এই মানুষ—যার কাছাকাছি যেতেও আমার ঘেন্না হত! যার অস্তিত্বকে আমি কোনোদিনই স্বীকার করি নি! আজ সে আমার রুকুকে কেড়ে নিতেই একটা স্বীকৃত অস্তিত্বে পরিণত হল। ঘৃণা, ঘৃণা এবং ঘৃণা! আমার বুকের ভেতরটা ঘৃণায়, আর অসহায় রোষে আর ক্ষোভে জলেপুড়ে যাচ্ছিল।……

প্রফুল্লবাবুর উদ্বেগ প্রশমিত করে বিকেল নাগাদ বৃষ্টিটা একেবারে থেমে গেল। মেঘের ফাটল দিয়ে ঝকমকে রোদ চুঁইয়ে পড়তে থাকল। সন্ধ্যার কিছু আগে, বারিচাচাজি সম্ভবত তখন বড়োগাজির সঙ্গে কথা বলতে তাঁর আত্মীয় এবং খুদে জমিদার রফিকুল হাসানের বাড়ি গেছেন, আমি বেরিয়ে গিয়ে আস্তাবলে কালো ঘোড়াটির খোঁজ করলাম। সহিস মহিউদ্দিন জানাল, দেওয়ানসাহেব নিয়ে গেছে ওকে। তখন ভিজে মাটিতে হাঁটতে-হাঁটতে নদীর ধারে গেলাম।

কাল্লুকে খুঁজছিলাম। ইদানীং তাকে প্রায়ই জেলেদের নৌকায় ওপারে মেহরুর কাছে গিয়ে আড্ডা দিতে দেখেছি। দুদিন আমাকেও নিয়ে গিয়েছিল সে। মেহরু লোকটি দারুণ ভালো। আমি মৌলাহাটের পিরসায়েবের ছেলে শুনে সে আমাকে কোথায় রাখবে, কীভাবে খাতির করবে, ভেবেই পেত না। কিন্তু দ্বিতীয় দিন ওর কাছে গিয়ে আবিষ্কার করি, মেহরুর একটি বউ আছে। আর সেই বউটি আয়মনির বয়সী—যুবতী। তালডোঙা বেয়ে সে ওপারে গিয়ে মধ্যবয়সী স্বামীকে খাদ্য দিয়ে আসে। রাত্তিরটা স্বামীর কাছেই কাটায়। কাল্লু চোখে ঝিলিক তুলে বলেছিল, মেয়েটা বহত কসবি আছে।

কসবি শব্দটা ওই বয়সেও কিছুটা রহস্যময় ছিল আমার কাছে। রবির মুখে কসবি শব্দের কোনো খোলা ব্যাখ্যা শুনি নি। বড়োগাজির দ্বিতীয় পক্ষের বউ—যার সঙ্গে রবি কোনো এক দুপুরে শুয়েছিল, আমি বিশ্বাস করতেই পারি নি—তো তাকে রবি কসবি বলত মনে পড়ে।

এর ফলে মেহরুর বউ সম্পর্কে আমার একটা অসচেতন কৌতূহল জেগে থাকবে। সূর্যাস্তের আগে লালচে রোদে বিস্তীর্ণ বনভূমি, ধানখেত, সব শ্যামলতা খুবই কোমল দেখাচ্ছিল। ভরা ছোট্ট নদীটির এপারে দাঁড়িয়ে যখন কাল্লুকে খুঁজছিলাম, দেখলাম কাল্লু ওপারের মাচানে বসে মেহরুর হুঁকোটি টানছে এবং মেহরু হাত নেড়ে তাকে কিছু বলছে।

আমি কাল্লুকে চেঁচিয়ে ডাকতে যাচ্ছিলাম, থেমে

গেলাম আমার বাঁ-পাশে ঝোপঝাড় ঠেলে মেহরুর বউকে বেরুতে দেখে। সে যেখানে দাঁড়াল, তার নীচেই কালো তালডোঙাটি বাঁধা আছে। সেদিকে পা বাড়াতে গিয়ে আমার দিকে ঘুরল মেহরুর বউ। শেষ বিকেলের লাল রোদে তার নাকছাবিটা জ্বলে উঠেছিল। হঠাৎ ওই আলোর রঙে তার মুখটি আয়মনির চেয়ে অনেক—অনেক বেশি সুন্দর মনে হল। তার গড়নে আয়মনির মতো পুষ্টতা বা বলিষ্ঠতা নেই। কিন্তু জীবনের এ যেন এক বিস্ময়কর খেলা, কোনো এক মুহূর্তে কাউকে প্রচণ্ড চেনা মনে হয়ে যায়—যেন মাথার খুব ভেতরদিকটায় একটা হুলুস্থুল পড়ে যায়, ভাবি—আরে! একে তো কতকাল ধরে চিনি, নিবিড় করে জানি—ঠিক যেমনটি একদিন মনে হত রুকুকে দেখে!

মেহরুর বউয়ের নাম আসমা, সেটা কাল্লুর জানা। আসমা আমাকে দেখে একটু হেসে বলে উঠল, কী মিয়াঁ, যাবেন নাকি ওপারে?

ঝটপট তার কাছে চলে গেলাম। জলকাদার জন্য খালি পায়ে বেরিয়েছিলাম। আসমা তালডোঙায় চড়ে হাত বাড়াল এবং নির্দ্বিধায় তার হাতটা জাঁকড়ে তালডোঙায় পৌঁছলাম। ডোঙাটা খুব টলমল করছিল। আসমা হাসতে-হাসতে বলল, এই গো! নিজেও ডুববে! আমাকেও ডুবিয়ে ছাড়বে।

জীবনে সেই প্রথম তালডোঙায় চাপা। ডোঙাটার ভেতর একটু জল ছিল। টলোমলো, লম্বাটে, তালগাছের গোড়ার দিকটা খোদাই করে তৈরি জিনিসটির ভেতর একটা আশ্চর্য বোধ আমাকে ভূতের মতো পেয়ে বসল। স্রোতের টানে ভেসে চলার বোধ বললে খুব কমই বলা হবে। একটি কালোরঙের ঘোড়া আমাকে যে-গতির হাত ধরিয়ে দিয়েছিল অথবা দিতে চেয়েছিল এবং আমি গতিকে চিনেছিলাম, সেই গতি নতুন চেহারায় সামনে এসে হাত বাড়িয়েছিল। যেন বলছিল, আয় ভাই, আমরা যাই! আর বেহালার টান-টান-করে-বাঁধা তারের মতো এই নদী, আবার গতির প্রতীক হয়ে-ওঠা আরেকটি কালো জিনিস, আর ওই যুবতী নারী—টলায়মান অবস্থায় যখন তার দিকে তাকালাম, আবার একই সঙ্গে তাকালাম যুগপৎ টান-টান স্রোতস্বিনী আর কালো প্রতীকটির দিকেও, একটা প্রগলভ মত্ততা আমাকে বাচাল করে ফেলল। আশ্চর্য, আমি হেসে উঠলাম। রুকুর কথা ভুলে গেলাম। অকিঞ্চিৎকর হয়ে গেল রুকু এইসব কিছুর কাছে, যার ওপারে স্বাধীনতা—প্রকৃতি, বারি চৌধুরির নেচার। আর আসমাও হাসছিল। তার গায়ে আয়মনির মতো জামা ছিল না। তার পরনে ছিল নীলচে নেতিয়েথাওয়া তাঁতেবোনা শাড়ি—সেও হাঁটুর নীচে অব্দি টানা। তার একহাতে ছোট্ট একটা বৈঠা। অন্যহাতে কীভাবে হঠাৎ খোঁপা-ভেঙে-পড়া চুল ঝুঁটি বাঁধতে গিয়ে উন্মোচিত হয়ে গেল স্তন। ভরাট, নিটোল, কোমলতাময় কাঠিন্যে অসংবৃত তীক্ষ্ণাগ্র একটা মাংসপিণ্ড, যা আমার মতো ষোলো-সতেরো বছর বয়সের একটি ছেলেকে দ্রুত ফিরিয়ে দেয় তীব্র স্মৃতিতে ভরা এক হারানো পৃথিবী আর সময়কে, তার ধোঁয়াটে ধুলোয় ধূসর শৈশবকে।

এখন ভাবি, পুরুষের জীবনে ওই যেন কঠিন নির্বাসনের কষ্ট-কাল! নারীর জরায়ু থেকে বেরিয়ে এসে নিরন্তর নারীর সঙ্গে-স্পর্শে-সাহচর্যে বেড়ে উঠতে-উঠতে তারপর সে ধীরে দূরে সরে যেতে থাকে অথবা তাকে সরিয়ে দেওয়া হয় দূরে। নারীর শরীর, নারীর স্তন, নারীর ঠোঁট তাকে অচ্ছুত করে ফেলে। নিষিদ্ধ হয়ে ওঠে প্রিয় এক জগৎ, এবং নির্বাসিতের মতো, অচ্ছুতের মতো তারপর দূরে সরে থাকা। আবার প্রতীক্ষায় থাকা, কবে ফিরবে প্রিয়তম ঘরে? কবে ফিরে পাবে সে নারীর শরীর, নারীর স্তন, নারীর ঠোঁট এবং নারীর জরায়ু—শরীরের পারুষ্যের যৌবনের রক্তমূলা দিয়ে, সকল পেশীর শক্তি দিয়ে হবে তার প্রত্যাবর্তনজনিত পুনরভিষেক? কবে সে ফিরবে পুরনো কোমল ঘরে? কৈশোর সেই প্রতীক্ষা আর নির্বাসনের কাল।

অবচেতন বিহ্বলতায় আমি আসমার উন্মোচিত বাম

স্তনটিকে দেখছিলাম। ধূর্ত বন্য যুবতী তা বুঝতে পেরেছিল। সে মুখ টিপে হেসে ডোঙাটির মুখ ঘোরাল স্রোতের কোনাকুনি এবং চাপা স্বরে বলে উঠল, খুব যে! অ্যাঁ?

কী আসমা? টলোমলো ডোঙায় বসে বাচালতা করে বললাম।

আসমা ঠোঁট কামড়ে ধরে বহতা জলের ভেতর নিজের দুধারে পর্যায়ক্রমে বৈঠার আঘাত হানছিল। ওই কামড়ে-ধরা ঠোঁটে শব্দহীন তীক্ষ্ণ হাসি ছিল। ওই হাসিতে কথা ছিল। সেই কথা আমি অনুভব করছিলাম আর আমার ভেতর ঝাঁপিয়ে পড়ছিল বারবার দুর্দান্ত স্বাধীনতার ঘা, ওই বৈঠার প্রতিটি শব্দময় ঘা—যা তলোয়ারের কোপের মতো। নীচের নদীটির মতো আমি ভেঙে পড়ছিলাম। আঘাতের শব্দ শুনছিলাম বুকের ভেতর দিকে।

তো ডোঙাটিকে কি ইচ্ছে করেই আসমা দেরি করিয়ে দিচ্ছিল? কিংবা তীব্র স্রোতের টানে, বৃষ্টির পর নদীর জলটাও বেড়েছিল সেদিন, ডোঙাটিকে সরাসরি ওপারে নিয়ে যেতে পারছিল না সে? দেখলাম, মেহরুর কুঁড়েঘর বাঁদিকে সরে যেতে-যেতে হিজলজাম-জারুলের জটলার আড়ালে পড়ে গেছে। কোনাকুনি এগিয়ে তীরের কাছাকাছি হয়ে আসমা তার নীচের ঠোঁটকে মুক্তি দিল। ফিক করে হেসে বলল, পিরসাহেবের ছেলে জাদুমন্তর কী দোয়া-দরুদের ভেলকি জানে মোনে হয়। আজ আমাকে কী, আমার ডোঙাকেই যেন বেবশ করে দিলে গো! লাও, টানো এখন কদ্দুর উজোন!

কিন্তু সে উজানে মেহরুর কুঁড়ে অব্দি নিয়ে গেল না ডোঙাটিকে। সামনেই অর্ধবৃত্তাকার ধসছাড়া একটি স্রোতহীন অংশ লক্ষ্য করে এগিয়ে গেল। সেখানে মাটির ভিজে চাঙড়ে একটা ডাঁডুলে গাছের মোটা আর সরু অজস্র শেকড় বেরিয়েছিল এবং গাছটিও ঈষৎ ঝুঁকে পড়েছিল নদীর দিকে। সেই শেকড়ে ডোঙার মাথার দিকে ছেঁদা করে গিঁটবাঁধা একটা দড়ি বাঁধল আসমা। বৈঠাটি একহাতে, অন্যহাতে ন্যাকড়ায় বাঁধা তার স্বামীর রাতের খাবার—হয়তো জামবাটিভরা ভাত-তরকারি। সে শেকড়ের ফাঁকে পা বাড়িয়ে দিতে প্যাচপেচে কাদায় পা ডুবে গেল। তখন সে খিলখিলিয়ে হেসে বলে উঠল, ও মিয়াঁর ব্যাটা, ইবারে আমাকে তুমি বাঁচাও। আহা, উঠে এসো না বাবু!

সে এখন আমাকে 'তুমি' সম্ভাষণ করছে! আমি শেকড়বাকড়ে পা রেখে হামাগুড়ি দেওয়ার ভঙ্গিতে শক্ত এবং ঘাসোচাকা পাড়ে পৌঁছলাম। তারপর হাত বাড়িয়ে দিলাম। সে তার স্বামীর খাদ্যটা দিল আমাকে। একজন চাষাভুষো মানুষের খাদ্য বইতে হচ্ছে আমাকে, এটা একদিন আগে ঘটলেও খুব অপমানজনক গণ্য করতাম। কিন্তু আজ আমি ভিন্ন এক মানুষ। আর এখানে স্বাধীনতা—বারি চৌধুরির 'নেচার'। দুর্দান্ত এক বন্যতা আমাকে পেয়ে বসেছে। আমার নতুন চুস্ত পাজামা-পানজাবিতে হলুদ পলিমাটি মেখে গেছে যথেচ্ছ। হাত বাড়িয়ে ন্যাকড়ায় বাঁধা জামবাটিটা নিলাম। তখন আসমা বলল, ওখানে রাখো। রেখে আমাকে ইবারে ওঠাও!

তার নির্দেশ পালন করলাম। কিন্তু ভেবেছিলাম, সে বৈঠাটাই বাড়িয়ে দেবে—তা দিল না। বাঁহাতে বৈঠাটা পাঁকে লাঠির মতো দেবে ডানহাতটা বাড়াল। তার হাতে আয়মনির হাতের মতোই একগোছা নানা-রঙের কাচের চুড়ি ধ্বনি-প্রতিধ্বনিময়। আয়মনির হাতের ছোঁওয়া একটু-আধটু পেয়েছিলাম। কিন্তু কখনও সে-ছোঁওয়া এমন প্রত্যক্ষ আর জোরালো ছিল না। মনে হল সৌন্দর্য বা চেহারার লালিত্যের তুলনায় আসমার হাতখানি ঈষৎ রুক্ষ আর শক্ত। শ্রমজীবী নারীর হাত। আয়মনির বাপের তো জমিজিরেত আছে প্রচুর। কিন্তু আসমার মধ্যবয়সী স্বামীটি খুবই গরিব মানুষ। সামান্য একখানি ধানখেত আর নদীর কাঁধে 'কাঁধা' একটুখানি জমির মালিক সে। ওই ধানখেতের কোনো ভরসা

নেই। কারণ হঠাৎ বৃষ্টিতে নদীর এপার ছাপিয়ে বন্যায় সব ভেসে যেতে পারে। এপারে কোনো বাঁধ নেই। বাঁধ অন্যপারে কাছারিবাড়ির পেছনে সমান্তরাল।

এখন ঘন গাছপালা। বৃক্ষলতার এমন ঠাসবুনোট কারুকার্য প্রথম যেদিন দেখি, সেদিনকার অনুভূতি আর আজকের দিনশেষের এই অনুভূতি এক নয়। শেষবেলায় নদীর বাঁকের ওপারে বিধ্বস্ত কুঠিবাড়ির জঙ্গলের নীচে সূর্য নেমে গেলে নদী আর এই বনভূমি কী এক রহস্যময় ধূসরতায় ছমছম করছিল। জনহীন এই নিসর্গে প্রকৃতির ফিশফিশ ষড়যন্ত্রের মতো হালকা আর শিরশিরে হাওয়া বইছিল। জামবাটিটি তুলে নেওয়ার আগে আসমা বৈঠাটা নরম ঘাসেঢাকা মাটিতে বিঁধিয়ে দুটি মুক্ত হাত উঁচু করে খোঁপা বাঁধতে লাগল। আবার উন্মোচিত হল তার স্তন, পুরোপুরি নয়—অর্ধোন্মোচিত। আর অবিশ্বাস্য হঠকারিতায় প্রাকৃতিক স্বাধীনতা হাহাকার করতে-করতে অথবা গর্জন করতে-করতে আমার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল।...

দেখো শাস্ত্রী! এই দেখো, আমার হাতের লোম খাড়া হয়ে গেছে। শিরশির করছে রোমাঞ্চের তীক্ষ্ণ যন্ত্রণা সারা শরীরে। তবে সেই প্রথম স্বাধীনতার অঙ্কুরোদ্গম আমার দেহ-মনে। সেই প্রথম প্রকৃতির করতলগত হওয়া! সেই প্রথম কালো ঘোড়াটির অন্ধ হয়ে যাওয়া। তার হ্রেষা আর খুরধ্বনি সেই প্রথম।

আসমা অর্ধস্ফুট স্বরে বলে উঠেছিল, আ ছি ছি! এ কী, এ কী! তুমি না পিরসায়েবের ছেলে?

ভিজে চবচবে ঘাসের ওপর বাঘের হরিণ ধরার মতো একটা ধস্তাধস্তি চলছিল। আসমার শরীরে আমার শরীর মাথা কোটার ভঙ্গিতে আছড়ে পড়েছিল। হায় শরীর! মানুষের হারামজাদা শরীর! শুয়োরের বাচ্চা শরীর!

কুচ্ছ তকলিফ, সাব?

তাকালাম।

ডিপটি জেলরবাবুকো খবর ভেজুঙ্গা ডাগদারকে লিয়ে?

না।

আপ শো যাইয়ে সাব! বারাহ্ বাজ গয়া!

আপনা কাম করো ভাই, আপনা কাম করো!

লম্বানেকো শাস্ত্রীটির পাশে বেঁটে শাস্ত্রীটি এসে দাঁড়াল। বলল, ক্যা জী?

কুছ নেহি ভেইয়া, কুছ নেহি!

বেঁটে ভারি সঙ্গীন বাগিয়ে কাঁধে রেখে আস্তে বলল, শোচিয়ে মাত্ সাব! খুদা কিসিনে জিন্দা রাখনে চাহে তো উসকো মার ডালে কৌন? আপিল পেশ কিয়া—শুনা। শোচিয়ে মাত্। শো যাইয়ে আরামসে!

সে আরও সমবেদনায় বলে উঠল, কেত্তা আদমি বিমারিসে মর্ যাতা! মউতকো তো সাথ-সাথ লে কর্ আদমি দুনিয়ামে আতা হ্যায় সাব! আপ লিখ্খা-পঢ়াহ্ আদমি। সবই জানতে হেঁ আপ!

তাদের বুটের শব্দ বুকের ভেতরটা মাড়িয়ে দিয়ে গেল। আমি সরে গিয়ে দেওয়ালের দিকে তাকালাম! দেখলাম সামনে মেহরু দাঁড়িয়ে অথবা বসে আছে, কিংবা সে কোনো একভাবে আছে। তার কণ্ঠস্বরের আশ্চর্য প্রতিধ্বনি এতকাল পরে ভেসে উঠল। মউতকো তো সাথ-সাথ লে কর্ আদমি আতা হ্যায় দুনিয়ামে! আর মেহরু বলেছিল, জেবন-মরণ দুটি ভাই—একই সঙ্গেতে জন্ম লয় মায়ের জঠরে। একই সঙ্গেতে বাড়ে। দু-ভাইয়ে কত ছলচাতুরি, কত লুকোচুরি খেলা। তবে কথা কী, কালসাপ লিয়ে মানুষের বসবাস। তমু মানুষের ই কথাটো খ্যাল হয় না গো! তমু মানুষ কী করে সব ভুলে থাকে!

মেহরু বলত, তাদের বংশের পদবি খামরু। তাই সে মেহেরু—মেহেরুদ্দিন খামরু। কারণ তার পূর্বপুরুষের ঢের জোতজমা ছিল। খামার ছিল। খামারবাড়িটা নাকি এত বড়ো ছিল যে লোকেরা তাদের খামরু বলে সম্ভাষণ করত। কিন্তু এই রাক্ষসী নদী আর নবাব-বাহাদুর আর হরিণমারার বড়োগাজির মামাতো ভাই ইন্দ্রাণীর খুদে জমিদার রফিকুলের পূর্বপুরুষ খামরুবংশকে ভিখিরি করে দিয়েছিল। এখন সে প্রফুল্ল সিঙ্গিকে সেলামি দিয়ে ওই ডুবো জমিটুকু সালগুজারি বন্দোবস্ত নিয়েছে। দু-আনা পাঁচ-গণ্ডা খাজনা আর ম্যানেজারবাবুকে শীতের সময় দশ আড়ি ধান ভেট। আড়িটি বেতে তৈরি একটি পরিমাপপাত্র। কিন্তু মেহরুর সন্দেহ, আড়িটির প্রান্তিক বেড়ে দুটি বাড়তি বেতের চক্কর আছে।

এখন এবং আরও পরে মেহরুর কথা মনে এলেই বিব্রত বোধ করতাম। একজন দার্শনিককে আমি ঠকিয়েছি! এদেশের এক মেঠো সোক্রাতেসকে আমি দূর কৈশোরে শুধু মিস করি নি, তাকে অপমানও করেছি! আর কী জঘন্য কথা, লালবাগ শহরের নবাবি হাতির শতমার কাল্লু পাঠান তাকে একদিন ঠাট্টা করে বলেছিল, মেহরু! তুমি কেমন মোরোদ আছ—কী তুমার বিবি এইসা ভেগে গেল? তো হামাকে দেখো, হামি পাঠানবাচ্চা আছে। হামার উমরভি তুমার সমান আছে। হামারভি ছোটি এক বিবি আছে। তো—

মেহরু, দার্শনিক মেহরু অশালীন খিস্তি করে নিজের শিশ্নটির শক্তি বোঝাতে হাতির পায়ের শেকল-বাঁধা লোহার গোঁজের উপমা দিয়েছিল! কাল্লু পাঠান হা-হা করে হেসে অস্থির। আমিও খুব হেসেছিলাম। মনে হয়েছিল, সে যা বলেছিল, তা কদাচ সত্য নয়।

সত্য নয়, তার কারণ আমি বুঝতে পারতাম। হায় মেঠো দার্শনিক, প্রশ্নটি শিশ্নমূলক নয়, অন্য কিছু। তা হয়তো ভালোবাসামূলক। অনাথা একলা-বেড়ে-ওঠা মেয়ে আসমা, যে দুনিয়ার—তা যত ছোটো হোক তার সেই দুনিয়া—শুধু শিশ্ন দেখেছে, দেখে নি ভালোবাসা। ভালোবাসা ভিন্ন এক জিনিস। সব মানুষ তা পায় না—বোঝে না, বা চেনে না। সে প্রকৃতির শেখানো বুলি আওড়ায়। যে-আবেগে পাখিরা খড়কুটো বেঁধে বাসা বানাতে ব্যস্ত হয়, সেই জৈব আবেগমাত্র। ভালোবাসা আবার সবাইকে সয়ও না। সয় নি বারি চৌধুরিকে। অনেক পরে যা জানতে পেরে অবাক হয়েছিলাম। কেন তাঁর চিরকুমার থাকার বদখেয়াল, কেন অমন দৃকপাতহীন নির্বিকার ব্রহ্মচর্য, অনেক দেরিতে বুঝতে পেরেছিলাম। আর আমার বেলাতেও তাই। আমি ভালোবাসা পেয়েছিলাম। জেনেছিলাম। কিন্তু ভালোবাসা আমাকেও সয় নি!..

তো এক আশ্বিনের দিনের বৃষ্টিবাদলার শেষে ধূসর আলো-আঁধারে ভিজে স্যাঁতসেঁতে ঘাসের ওপর সেই প্রথম নারীশরীরের ভিন্ন এক স্বাদ পেয়েছিলাম। ছটফটে, কোমলতাময় দৃঢ়, শ্রমজীবী গ্রামীণ এক যুবতীর শরীর কেন্দ্র করে আনাড়ি, অবোধ এক বিস্ফোরণ মাত্র। তার বেশি কিছু নয়। হয়তো এজন্য হরিণমারার কাজি হাসমত আলির ছেলে রবিউদ্দিনের সহবাসকে দায়ী করা যেতে পারে। হয়তো রবিই আমাকে ভেতর-ভেতর নষ্ট করে ফেলেছিল। কিন্তু একথাও হয়তো বা সমান সত্যি যে, আমি রুকুর ওপর প্রতিশোধে উন্মত্ত হয়ে উঠেছিলাম। আমার মাথার ঠিক ছিল না সেদিন। একটা সাংঘাতিক কিছু করে ফেলতে চাইছিলাম। আর কলঙ্কিনী নামে ইন্দ্রাণীতে বদনামকুড়ুনি যুবতী আসমা যেন ইচ্ছে করেই সেই সুযোগ করে দিয়েছিল! নইলে কেন সে তার স্বামীর আস্তানা থেকে অতটা দূরে ভাটিতে গিয়ে ডোঙা পাড়ে ঠেকিয়েছিল, যেখানে শিয়রে প্রগাঢ়ভাবে জড়াজড়ি করে দাঁড়িয়ে থাকা বৃক্ষলতার আড়াল আর অবাধ নির্জনতা?

হুঁ—সবই তার সাজানো মনে হয়েছিল পরে। কিন্তু কী পেয়েছিলাম আমি? সত্যিই কি কোনও জৈব সন্তোষ কিংবা যাকে বলে 'মানুষের রক্তের স্বাদ পাওয়া বাঘে'র তৃপ্তি এবং বেড়ে-ওঠা লোভ? কিছু না, কিছুই না। বরং আমার গা ঘিনঘিন করছিল। ভরা স্রোতবতী নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়ে শরীরকে, আমার নিষ্পাপ শুদ্ধ শরীরের নোংরামিটাকে ধুয়ে ফেলতে ইচ্ছে করছিল। কিন্তু পুকুরে সাঁতার কাটার অভ্যাস থাকলেও কখনও স্রোতের জলে সাঁতার কাটি নি—সেই ভয়। আরও এক অদ্ভুত ভয় আমাকে আড়ষ্ট করে ফেলেছিল। আব্বা বলতেন, আমাদের বংশের শরীরে পবিত্রপুরুষ পয়গম্বরের

রক্তের ধারা বয়ে চলেছে। মাথা নীচু করে নদীর দিকে তাকিয়ে ত্রাসে কেঁপে উঠেছিলাম! আব্বার অনুচর কোনো জিন কি দেখে ফেলল আমার এই পাপক্রিয়া? ত্রাসে অনুশোচনায় আমি কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকলাম আর আসমা তার শাড়িটি নতুন করে পরে নির্বিকার মুখে উঠে দাঁড়াল। তারপর জামবাটি আর বৈঠাটি কুড়িয়ে নিয়ে পা বাড়াতে গিয়ে হঠাৎ থামল। বলল, মিয়াঁর প্যাটে-প্যাটে এত, তা জানতাম না!

সে বাঁকা হাসছিল। আমি ভাঙা গলায় অতিকষ্টে ডাকলাম, আসমা!

বুলো।

আমি মাফ চাইছি। তুমি কাকেও—

আসমা দ্রুত এসে খুব হঠাৎ চটাস শব্দে আমার বাঁ গালে চুমু খেল। হাসি আর শ্বাসপ্রশ্বাস জড়ানো গলায় বলল, ও কী কথা গো ছেলের? ওপরে আসমান, নীচে মাটি—পক্ষিটিও জানবে না।

তারপর সে যে কথাটা বলল, আমি অবাক হয়ে গেলাম শুনে। সে ফিশফিশ করে বলে উঠল ফের, এমন করে মোনের সুখ মেটে না। তুমি দুকোরবেলা ওপারে ঝোড়ের ভেতর থেকো। তখন মিনসে থাকে না কুঁড়েতে। দহে মাছ ধরতে যায় জাল লিয়ে। আমি লিয়ে আসব তুমাকে।

বলেই সে লম্বা পা ফেলে এগিয়ে গেল এবং একবার ঘুরে যখন দেখল, আমি আসছি না, তখন সে ইশারা করল তাকে অনুসরণ করতে। আস্তে বললাম, আমি যাব না।

আসমা চলে-যাওয়ার কিছুক্ষণ পরে ডাক শুনতে পেলাম কাল্লুর, ছোটাসাব! ছোটাসাব!

সাড়া দিলাম না। নদীর পাড়েই একটা প্রকাণ্ড গাছের শেকড়ে বসে একটুকরো শুকনো কাঠি কুড়িয়ে আঁক কাটছিলাম। ভীষণ ক্লান্ত শরীর, শুওরের বাচ্চা হারামজাদা নেড়ি কুত্তা শরীর! এখন এত ভারি, এত বিধ্বস্ত! আর তখন আমার ব্যক্তিগত আবহমণ্ডলে আসমার চুলের আর সারা শরীরের ঘ্রাণ। বুঝতে পারছি না এ ঘ্রাণ নিয়ে আমি কী করব? একে সরাতেও তো পারছি না! বুঝতে পারছি না এ ঘ্রাণ সুখের, না জঘন্যতার।

কাল্লুর হাসি শুনতে পেলাম পেছনে। ঘুরলাম না তবু। কাল্লু বলল, ছোটাসাব! এখানে কী কোরছেন একেলা বৈঠকার? হামি আপনাকে মেহরুর বহুর সাথে আসতে দেখল। তো ছোকড়ি মাকে বলল, ছোটাসাব একেলা ঘুম কোরতেছেন ইধার! আইয়ে, আইয়ে! ইধার সাঁপ-উপ থাকবে। জংলি জানবার ভি। আইয়ে।

সাপের কথায় এতক্ষণে চমকে উঠলাম। সাপ থাকার কথা ভুলেই গিয়েছিলাম এতক্ষণ। দিনের শেষ আবছায়া-ভরা আলোটুকু, যা কররেখা অস্পষ্ট করে তুলেছে, চকিতে ফণাতোলা অজস্র সাপের ছবি আঁকতে থাকল আমার চারপাশে। উঠে দাঁড়ালাম। কাল্লু পথ দেখিয়ে মেহরুর কুঁড়ের দিকে নিয়ে চলল।

গাবতলার মাচানে পা ঝুলিয়ে আসমা বসে আছে। কুঁড়েঘরটির ভেতর রেড়ির তেলের পিদিম জ্বলছে। সেই ম্লান আলো কেন্দ্র করে পোকামাকড় থকথক করে চক্কর যাচ্ছে। একটু দূরে মেঝেয় পা ছড়িয়ে বসে মেহরু জামবাটি থেকে সশব্দে ভাত খাচ্ছে। আমাদের সাড়া পেয়ে মুখ তুলে একবার দেখার চেষ্টা করে বলল, কাল্লুভাই?

হাঁ। ছোটাসাবকে লিয়ে আসল।

মেহরু এঁটোমুখে বলল, বসেন হুজুর, বসেন! আমি খাওয়াটুকুন সেরে লিই! বলে সে বউকে ডাকল, ওরে! কাল্লুভাইকে তামুক সেজে দে দিকিনি!

আসমা অমনি মাচা থেকে নেমে বলল, সাজো তুমি তামুক। আমি চললাম। আঁধার হয়ে গেল দেখছ না? রহিমা এতক্ষণ ঘর-বার করছে আমার জন্যে।

সে তার মরদকে গ্রাহ্য করল না। গজগজ করতে করতে বৈঠাটি নিয়ে জঙ্গলের ভেতর দিয়ে এগিয়ে গেল আবছা আঁধারে। দু জায়গায় ঘরকন্নার ঝকমারির

কথাই সে বলতে-বলতে গেল। আর তাই শুনে ব্যা-ব্যা করে হেসে তার বোকাসোকা দার্শনিক মরদটি এঁটো ঠোঁটের নিচে জঙ্গলে দাড়িতে এককুচি ভাতসহ বলে উঠল, শুনো কথা কাল্লুভাই! হারামজাদির কথা শুনো!

কাল্লু অবাক হয়ে সহাস্যে বলল, আজ তুমহারা বিবি থাকল না তুমার কাছে? বাত ক্যা ভেইয়া মেহরু?

মেহরু গুম হয়ে বলল, বাড়িতে আপ্তকুটুম এসেছে। আমার ভাগ্নী কাচ্চাবাচ্চা লিয়ে এসেছে তো! তাদের খাওয়া-দাওয়া, মেহমানি তো করাতে হবে, না কী? তমে তামুকটা সেজে দিয়ে গেলে কী ক্ষেতি হত, বুলো কাল্লুভাই?

কাল্লু বলল, তো ঠিক হ্যায়। হামি সেজে লিচ্ছে।

খড়ের দড়ি জড়িয়ে মেয়েদের চুলের বেণীর মতো বাঁধা একটা জিনিসের মাথায় আগুন জ্বগজ্বগ করছিল। ওটাকে 'বিড়ে' বলে, আমি জানি। কাল্লু জানে কোথায় তামাক আছে। সে ব্যস্তভাবে তামাক সাজতে বসলে আমি বললাম, কাল্লু! আমরা ওপারে ফিরব কী করে এবার?

কাল্লু হাসল। রোজ য্যায়সে আনা-যানা করি, ওইসে। বৈঠিয়ে না!

খাওয়া শেষ করে তৃপ্তির ঢেকুর তুলে মেহরু নদীতে গেল জামবাটি ধুতে। ফিরে এসে সে জাঁকিয়ে মাচানে বসে কাল্লুর হাত থেকে হুঁকো টানতে-টানতে খোদা-তালার মেহেরবানির কথা ঘোষণা করছিল। আকাশের অবস্থা থেকে কী ডর না পেয়েছিল সে! না—সে এই নদীর সঙ্গে নিজে লড়াই করে জান বাঁচাতে পটু, এমন অনেক লড়াই সে সারাজীবন লড়ে আসছে, কিন্তু সেজন্য তার ডর জাগে নি। যত ডর দেড়বিঘে ধানখেতটার জন্য। বুকে থোড় গজিয়ে এখন ধানগাছ ডাগরডোগর হয়েছে। জলের তলায় চলে গেলে আর শীষ গজাত না, সেই ডর। তারপর কী করত মেহরু? সেই মাঘ সন্ধি প্রতীক্ষায় থাকতে হত এই মাচানের নীচে সামান্য দূরে 'কাঁধা' নামে ঢালু জমিটুকু জেগে ওঠার জন্য। সেই জমিতে সে কুমড়ো কাঁকুড় আর তরমুজের বীজ পুঁতবে। খরার মাসে সেগুলো নিয়ে যাবে তার বউ হাটতলায় হাটবারে বেচতে। এইসব কথা বলার সময় লোকটার প্রতি যুগপৎ ঘৃণা আর করুণা জাগছিল আমার। ঘৃণা—কারণ আসমাকে সে বউ করেছে। করুণা—কারণ তার এই বেঁচেবর্তে লড়াই। অবশেষে সে হুঁকোয় সুখটান দিয়ে কাল্লুকে দিল এবং বলল, ভাবতে গেলে এ দুনিয়াদারি এক ঝকমারি বটে হে, কাল্লুভাই! মাঝে-মাঝে ইচ্ছে করে, লাথি মেরে ফেলে ফকিরি লিই!

তারপর সে গুনগুন করে গান গাইতে লাগল। কাল্লু বলল, গলা ফাড়কে গাও ভেইয়া! তুমি তো বহুত ওস্তাদ লোক আছ! গাহ্না করো—ছোটাসাবকে শুনাও!

মেহরু এত সুন্দর গাইতে জানে! তখন চারদিক নিঝুম আঁধার। কুঁড়ের ভেতর রেড়ির তেলের পিদিমটি জ্বলছে এবং পোকামাকড়রা আত্মহত্যায় লিপ্ত। নদীর দিকে আবছা ছলচ্ছল একটা শব্দ শুধু। শরৎ-ঋতুর আকাশে ঝকমক করছে নক্ষত্রের ঝালর। দূরে একটু আগে যে শেয়ালগুলো ডাকছিল, তারা হঠাৎ থেমে গেছে। মেহরু কানে একটা হাত রেখে তান দিল, আহা রে—এ—এ···তা—না—না—না···

'ভেবো না ভেবো না বিফলো ভাবনা/ভাবিলে ভাবনা যাবে না দূরে···'

কাল্লু পাঠান সমের মাথায় বলে উঠল, বহুত আচ্ছা! মেহরু চেরা গলায় গাইতে লাগল। নদীতীরের এই সংগীতধ্বনি প্রতিধ্বনিত হয়ে দূর-সুদূর ছড়িয়ে যেতে থাকল। ওপারে কাছাড়িবাড়ির দোতলায় আলো জ্বলছিল। সেই আলোকে ছুঁয়ে মেহরুর গান মেঠো দার্শনিকতাকে বয়ে নিয়ে চলল কোথায়—যেন বা ওই নক্ষত্রপুঞ্জের দিকে, ওই লম্বাটে ছায়াপথের সীমানায়! আর আমি দেখলাম, কী বিশাল ওই আকাশ, কত জ্যোতির্ময়তা! তার কাছে কতটুকু এই মানুষের ভাবনা! মেহরুর ভাবনা! আমার ভাবনা! আর এই মেহরুর যুবতী বউয়ের শরীর থেকে প্রতিশোধের ছুতোয় আমি

যে শান্তি সংগ্রহে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলাম, তারই বা মূল্য কতটুকু? ছি ছি, এ আমি কী করলাম—কেন করে ফেললাম এই পাপ? অন্ধকারে আমার চুচোখ ভিজে যাচ্ছিল—জানি তা মেহরুর গানের বিষাদজনিত সংক্রমণে নয়, পাপবোধে।…

না—ওই বয়সে ঠিক এমন করে সাজিয়ে-গুছিয়ে কিছু ভাববার ক্ষমতা ছিল না, কিন্তু অনুভূতি ছিল। বোধ ছিল। নিজের ওপর দুঃখে করুণায় আমার কান্না পাচ্ছিল। আমার যে-শরীরে নাকি পবিত্র পুরুষের রক্তধারা বয়ে চলেছে, আর যে-শরীর নির্দিষ্ট ছিল অন্য এক নারীর জন্য, যাকে আমি বেহেশতের তুলনায় শ্রেষ্ঠ ও কাম্য বলে গণ্য করতাম—সেই শরীরকে আজ হঠকারিতায় আমি হারিয়ে ফেলেছি! আমি নিজের পবিত্র সত্তাটিকে হিজলজামজারুলের জঙ্গলে ভিজে ঘাসের ওপর জবাই করে ফেলেছি। আর এই নিরক্ষর মেঠো লোকটি সুর ধরে আমাকে শোনাচ্ছে, 'ভেবো না ভেবো না বিফলো ভাবনা/ভাবিলে ভাবনা যাবে না দূরে…!'

বড়ো অবাক লাগে হে শান্তিময়! বেহুলা নদীর ধারে এক আশ্বিনের সন্ধ্যারাতে আমার মাথার ভেতর উলটে এক বন্য ঘুণপোকা ঢুকে পড়েছিল। সত্যিই তো! বিশাল পৃথিবীতে বিরাট আকাশের নীচে মানুষের সব ভাবনাই কী অকিঞ্চিৎকর! তবু মানুষ ভাবে। ভাবনা ছাড়া মানুষের চলে না। দার্শনিক মেহরু ভাবনা নামে পোকাটিকে তাড়াতে গিয়ে সেটি আমার মাথায় ঢুকে পড়েছিল। আর সেই ভাবনার কুটকুট কামড়ানিতে অস্থির হয়ে বাকি জীবন আমি ছুটে বেড়ালাম বিভ্রমণে। কী না করে বেড়ালাম! স্বেচ্ছাচারিতার চূড়ান্ত।

মধু জেলে দূরের দহে বিকেল থেকে এক প্রহর রাত অব্দি ছোট্ট নৌকো নিয়ে মাছ ধরতে যেত। সে যথারীতি ফিরে এল মেহরুর কাছে তামাক খেতে। তার নৌকোয় আমরা ফিরে গেলাম ওপারে।

কাছারিবাড়ির ভেতর ঢুকে প্রতিমুহূর্তে গা শিরশির করছিল। আমাকে দেখে কি বারিচাচাজি চৈর পাবেন কিছু? আমি কি ধরা পড়ে যাব? আমার চুস্ত পাজামা-পানজাবিতে ঘাসের কুটো, পলিমাটির দাগ। কিন্তু দোতালার হলঘরে ঢুকলে বারি চৌধুরি বললেন, আয় শফি! কাল আমরা লালবাগ যাব ঠিক করেছি। কী? দারুণ সুখবর না? বারিচাচাজির সঙ্গে প্রফুল্ল-বাবু আর বড়োগাঙিও হাসতে লাগলেন।…

[ক্রমশ]

আমার চৈতন্যে রবীন্দ্রনাথ

শামসুর রাহমান

গোড়াতেই একটি কথা নিবেদন করতে চাই—আমি কৃতবিদ্য নই, তাই সরলমতি তরুণ শিক্ষার্থীদের চোখ বিস্ফারিত করে দেওয়া, অথবা ডাকসাইটে পণ্ডিতদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা আমার সাধ্যাতীত। আমি খুবই সাদাসিধা একটি নিবন্ধ রচনার উদ্যোগ নিয়েছি। আমি যে ধরনের নিবন্ধ রচনায় সচেষ্ট হয়েছি তাতে সাত কাহন মিথ্যা ঢুকিয়ে দেওয়ার যথেষ্ট অবকাশ রয়েছে। নিজের কথা, বিশেষ করে তা যদি হয় অন্তর্লোকের কথা, বলতে গেলে বানিয়ে-বানিয়ে একটা সুবিস্তৃত বাক্যজাল তৈরি করা সম্ভব। কে আর আমার মনের আসল খবর নিতে যাচ্ছে? আমি যা বলছি, তার সত্যাসত্য বিচারই বা করবে কে? আমি নিজেই যদি নিজের বিষয়ে মনগড়া এক তথা-তীর্থদর্শনের জন্যে পাঠকদের আমন্ত্রণ জানাই, তাহলে সেই তীর্থটি প্রত্যক্ষ করে সরলবিশ্বাসী ব্যক্তিদের পক্ষে তার অস্তিত্ব সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করা অশোভন মনে হতে পারে। তাই তাঁরা মিথ্যাকেও সত্য বলে গণ্য করবেন। যদি বলি, ছেলেবেলাতেই আমি রবীন্দ্রনাথের প্রচুর কবিতা পড়েছি, পড়ে অভিভূত হয়েছি, এ-কথা, আশা করি অনেকেই বিশ্বাস করবেন, আসলে কিন্তু আমার এই উক্তি সত্যের অপলাপমাত্র। আমরা অনেকেই জাহির করে থাকি যে, আমাদের মধ্যে সততার কোনো ঘাটতি নেই, কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে সততার পথ মাড়াতে আমাদের অনীহার কোনো শেষ নেই। যেহেতু আমি স্থির করেছি যে, যা বলব সত্য বলব, সত্য ছাড়া কিছু বলব না, তাই এ-কথা অকুণ্ঠচিত্তে কবুল করতে পারব যে, ছেলেবেলায় আমি রবীন্দ্রনাথের কোনো কবিতা পড়েছি বলে মনে পড়ছে না। বরং আমার মনে পড়ছে সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের 'ছিন্নমুকুল' নামের একটি বিয়োগান্ত কবিতা, যা আমাকে এত দূর আন্দোলিত করেছিল যে কবিতাটির বিষণ্ণ ছায়ায় আমার মৃতা বোনের স্মৃতির উদ্দেশে একটি গদ্যরচনা লিখেছিলাম। বলা যায়, না জেনে সেদিন আমি একটি গদ্যকবিতা লিখে ফেলি। কারণ, তখন গদ্যকবিতা কী বস্তু সে সম্পর্কে আমার কোনো ধারণাই ছিল না।

সত্যি বলতে কী, যখন ছোটো ছিলাম তখন আরো অনেক কিছুর মতোই রবীন্দ্রনাথের মহাপ্রয়াণের দিন আমি হঠাৎ ক্লাশ ছুটি হয়ে যাওয়ায় খুশিতে বাগ্ বাগ্ হয়ে শত্রি আম চিবোতে-চিবোতে বাড়ি ফিরেছিলাম। ছুটির উপলক্ষ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মৃত্যু, এই খবরটুকু কানে এসেছিল। কিন্তু কে এই রবীন্দ্রনাথ, এবং তাঁর মৃত্যুতে স্কুল ছুটিই বা হয়ে যাবে কেন অমন ঘুম করে, এই বিচার-বিবেচনা তখন আমার মধ্যে ছিল না। এ নিয়ে যদি পরিহাসনিপুণ কোনো ব্যক্তি ফোড়ন কাটেন, ভোর দেখলেই বলা যায় সারা দিনটা কেমন যাবে, তাহলে আমি লাজবাব। তবে সত্য কথা বলবার সিদ্ধান্ত যখন নিয়েছি, তখন সত্যভাষণই করব, মিথ্যাশ্রয়ী হব না। যেকালের কথা বলছি সেকালে আমি স্কুলের নীচু ক্লাসের ছাত্র। এদিকটা বিবেচনা করলে আমার অপরাধ পর্বতপ্রমাণ না-ও ঠেকতে পারে অনুকম্পায়ীদের কাছে।

আমার এই গুহাপর্বের অবসান ঘটে আরো কয়েক বছর পরে, যখন আমি সদ্য ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা দিয়ে ছুটির দাঁপে হালকা হাওয়ায় ভেসে বেড়াচ্ছি আপন মনে। হ্যাঁ, তখনি আমি প্রথম রবীন্দ্রনাথ বিষয়ে সচেতন হলাম, হঠাৎ আলোর ঝলকানি লেগে আমার চিত্ত ঝলমলিয়ে উঠল। কিন্তু এ এক কৌতুকপ্রদ ব্যাপার যে, এবারও রবীন্দ্রনাথের কোনো কবিতা আমাকে আন্দোলিত করে নি, আমাকে এক মোহন বিলোড়নের দখলে নিয়ে গেল কবিসার্বভৌমের কথাসাহিত্য : গল্পগুচ্ছ (দ্বিতীয় খণ্ড) পড়ে কেন জানি আমার বিশ্বাস করতে ইচ্ছে করল না যে, গ্রন্থটি কোনো মর্ত্যজীবী-কর্তৃক প্রণীত। এ ধরনের রচনা দেবলোকের বাসিন্দা ছাড়া কারো পক্ষে লেখা সম্ভব নয়, এই বিশ্বাস বদ্ধমূল ছিল কিছুদিন। গল্পগুচ্ছের মায়াবী শাসনে কয়েকটি মাস কেটে গেল। বাংলাদেশের নয়নভোলানো, হৃদয়দোলানো নৈসর্গিক জগতে আমি প্রবেশ করলাম। বলা যায়, এই প্রথম বারের মতো, এমন কিছু চরিত্রের সন্ধান পেলাম যারা দীর্ঘকাল আমার নিত্যসঙ্গী হয়ে থাকবে, আর পেলাম আমার মাতৃভাষার সেই জাদুশিহর, যা জাগানো সম্ভব শুধু রবীন্দ্রনাথের মতো মহান গদ্যশিল্পীর পক্ষে। এটা কি আশ্চর্যজনক নয় যে, বাঙলা ভাষার মহত্তম কবির সঙ্গে আমার প্রথম নিবিড় পরিচয় হল তাঁর গদ্যের মারফত? গল্পগুচ্ছের আগে তাঁর কবিতা যে পড়ি নি, এমন তো নয়। অন্তত 'দুই বিঘা জমি', 'জুতা-আবিষ্কার'—আর সেই আশ্চর্য পংক্তি 'এখনি আঁধার হবে বেলাটুকু পোহালে,' সম্বলিত কবিতা 'আষাঢ়' আমি পড়েছিলাম। 'দুই বিঘা জমি' আর 'জুতা-আবিষ্কার' আমার মনে তেমন দাগ কাটে নি, যদিও আমি স্বীকার করতে বাধ্য, 'আষাঢ়'-এর কালিমাখা মেঘে ওপারে আঁধার-ঘনিয়ে-আসা মুহূর্তে গোহালে-ফিরে-না-আসা ধবলীর জন্যে মন কেমন করত। তবে 'এখনি আঁধার হবে বেলাটুকু পোহালে'র অভিঘাতের জন্য আমাকে আরো কিছুকাল অপেক্ষা করতে হয়েছিল।

যা বলছিলাম, গল্পগুচ্ছই আমাকে পরম সুহৃদের মতো হাত ধরে পৌঁছে দিল রাবীন্দ্রিক জগতে, যে জগতের সম্মোহন কাটিয়ে ওঠা সহজ নয়। রবীন্দ্রনাথের এই চিরপ্রাজ্জ্বল গদ্যগ্রন্থ আমাকে রবীন্দ্ররচনাবলীর দিকে আকৃষ্ট করল, আরো বেশি করে, মহাকবির গদ্য, তাঁর কাব্যতীর্থের সঙ্গে আমাকে সংযুক্ত করল। আর আরো পরে, যে সংযোগ ঢিলে হয়ে আসবে, কিন্তু পুরোপুরি ছিন্ন হবে না কখনোই। আমার বাক্যটির ব্যাখ্যা প্রয়োজন। রবীন্দ্রমানস বিষয়ে আলোচনা করলে বাক্যটির অভিপ্রায় পরিস্ফুট হবে বলে মনে করি। রবীন্দ্রনাথ তাঁর পিতৃদেব মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের তত্ত্বাবধানে আবাল্য উপনিষদের তত্ত্বে দীক্ষিত হয়ে এমন এক মানসের অধিকারী হয়েছিলেন, যে-মানস এই পৃথিবীকে গ্রহণ করেছিল উপনিষদ-লক্ষ আধ্যাত্মিকতার হিরন্ময় আলোয়। সত্য, তিনি স্থূল পৃথিবীর বস্তুগত দিকটি অস্বীকার করেন নি, কিন্তু তাঁর এই স্বীকৃতিও উপনিষদ-নির্ভর। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, "সেই এক শুভ্র জ্যোতি যখন বহুবিচিত্র হন, তখন তিনি নানাবর্ণের আলোকরশ্মিতে আপনাকে বিচ্ছুরিত করেন, বিশ্বকে রঞ্জিত করেন ; আমি সেই বিচিত্রের দূত। আমরা নাচি নাচাই, হাসি হাসাই, গান করি ছবি আঁকি, যে আমি বিশ্বপ্রকাশের অহেতুক আনন্দে অধীর আমরা তাঁরই দূত। বিচিত্রের লীলাকে অন্তরে গ্রহণ করে বাইরে লীলায়িত করা—এই আমার কাজ।" রবীন্দ্রনাথ বারংবার সেই একজনের কথা বলেছেন নানা লেখায়, নানা-রূপে। মহাকবি তিনি, জগৎসংসার থেকে আহরণ করেছেন গভীর ব্যাপক অভিজ্ঞতা, পৃথিবীর ধূলিকে মধুময় বলে গ্রহণ করেছেন অন্তরের অন্তঃস্থলে, পৃথিবীকে প্রণতি জানিয়েছেন, তাঁর বোধ আর অনুভবের ব্যাপ্তি এবং গভীরতা তাঁকে মাটির কাছাকাছি যেতে উদ্বুদ্ধ করেছে, কিন্তু ঔপনিষদিক ভাববাদী জগতের স্মৃতি তাঁর মন থেকে মুছে যায় নি। যে আধ্যাত্মিক জগতে রবীন্দ্রনাথের ছিল স্বচ্ছন্দ বিহার, সেই জগৎ থেকে, প্রশ্নশীল নাচিকেত চেতনায় ভাষর দ্বন্দ্ববিক্ষুব্ধ আধুনিক মানুষ নির্বাসিত। এখানেই রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে আধুনিক মানুষের বিরোধের প্রশ্নটি বড়ো হয়ে দেখা দেয়। ফলে রবীন্দ্রনাথের পরবর্তী প্রজন্মের অধিকাংশ কবির কাছ থেকে তাঁর দার্শনিক সত্তা অর্ধ্যলাভে ব্যর্থ হয়েছে, কিন্তু তাঁর মহান কবিসত্তা তাদের পথরোধ করে দাঁড়িয়েছিল কেননা রবীন্দ্রকাব্যের অবিশ্বাস্য অজস্রতা এবং আকাশচুম্বী মহিমাকে অস্বীকার করবার মতো মানসিক ক্ষুদ্রতা কিংবা সামর্থ্য তাঁদের ছিল না, যদিও রবীন্দ্রবলয়ের বিরুদ্ধে বিদ্রোহঘোষণায় তাঁরা এক জোরালো ঐকতান সৃষ্টি করেছিলেন। তিরিশের কবি-গোষ্ঠীর অন্যতম প্রধান এক বিদ্রোহী রাত জেগে পাগলের মতো রবীন্দ্রনাথের কবিতা পড়তেন অশেষ মুগ্ধতায়, আর দিনে খাতার পাতার পর পাতা ভরিয়ে তুলতেন কবি-সার্বভৌমের বিরুদ্ধে প্রবন্ধ লিখে।

আমি যখন কবিতা লিখতে শুরু করি, তখন রবীন্দ্রনাথের কবিসত্তা আমার পক্ষে কোনো সমস্যা হয়ে দাঁড়ায় নি, কাজী নজরুল ইসলামকেও সহজে এড়িয়ে যেতে পেরেছি। তিরিশের কবিকুল যেমন রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে মুশকিলে পড়েছিলেন, আমিও তেমনি মুসিবতে পড়লাম রবীন্দ্রোত্তর কবিগোষ্ঠীকে নিয়ে, বিশেষত জীবনানন্দ দাশ আমার শিরঃপীড়ার কারণ হয়ে দাঁড়ালেন, যদিও আমি গোড়া থেকেই ছিলাম তাঁর একনিষ্ঠ ভক্ত। তাঁর এবং তিরিশের আরো দুজন কবির প্রভাব কাটিয়ে উঠতে আমাকে অনেক কাঠখড় পোড়াতে হয়েছে। এ-কথা আমাকে কবুল করতেই হবে, তখন আমার মনে রবীন্দ্র-কাব্য অতটা আকর্ষণ সৃষ্টি করতে পারে নি, যতটা করেছিল রবীন্দ্রনাথবহির্ভূত পাঁচ প্রধানের কবিতা। এবং আমি যৌবনে আত্মজৈবনিক একটি কবিতায় এরকম পংক্তি লিখতে দ্বিধা করি নি—

মধ্যপথে কেড়েছেন মন, রবীন্দ্র ঠাকুর নন
তিরিশের সন্মিলিত কবি।

এখানে স্মর্তব্য, পঞ্চাশের দশকে বুদ্ধদেব বসু -সম্পাদিত 'কবিতা' পত্রিকায় বোদলেয়ারের 'ক্লেদজ-কুসুম'-এর কবিতাগুচ্ছের মনোমুগ্ধকর অনুবাদ প্রকাশিত হচ্ছিল। অনুবাদক খোদ পরাক্রান্ত প্রবাদতুল্য সম্পাদক বুদ্ধদেব বসু। আরেকজন বিশিষ্ট কবি এবং কাব্যভোক্তা, ফরাসি ভাষায় যাঁর দখল ঈর্ষণীয় সেই অরুণ মিত্র অবশ্য বোদলের বলেন এবং 'ফ্লার দ্যু মাল'-র তরজমা 'ক্লেদজ কুসুম' অশুদ্ধ মনে করেন। আজ থেকে প্রায় চব্বিশ বছর আগে অরুণ মিত্র বুদ্ধদেব বসু-প্রণীত 'শার্ল-বোদলেয়ার : তাঁর কবিতা' গ্রন্থটির একটি মেধাবী আলোচনা করেছিলেন। সেই সমালোচনায় প্রশংসার সঙ্গে-সঙ্গে কিছু-কিছু অপ্রশংসাও ছিল। কিন্তু এতৎ-সত্ত্বেও সেই গ্রন্থটি আমরা যারা পঞ্চাশের দশকের কবি বলে চিহ্নিত, তাদের অনেককেই সম্মোহিত করেছিল। এবং আমি মনে করি, পঞ্চাশের দশকের কবিতার যে চেহারা দাঁড়িয়েছে তার কিছু অংশ হয়তো বুদ্ধদেব বসুকৃত সেই অনুবাদগুচ্ছ প্রকাশিত না হলে নির্মিত হত না। এমনকি সেই প্রভাব পঞ্চাশের দশকের কবিদের মধ্য দিয়ে বাহিত হয়ে ষাটের দশকের কবিদেরও স্পর্শ করেছিল।

'শার্ল বোদলেয়ার : তাঁর কবিতা' গ্রন্থটির কথা এজন্যে উল্লেখ করলাম যে, আমাদের রবীন্দ্রবিমুখতার জন্য

এই অনুবাদগ্রন্থ কিছুটা দায়ী। তা ছাড়া দুনিয়াকাঁপানো দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, তেরোশো পঞ্চাশের ভয়ংকর দুর্ভিক্ষ, মানবজাতির কলঙ্কসাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, দেশবিভাগ ইত্যাদি ঘটনার মধ্যে আমরা যারা ইতিহাসের ছেঁড়া পাতার মতো ভেসে বেড়িয়েছি মৃত্যুগন্ধী হাওয়ায়, তাদের পক্ষে রবীন্দ্রকাব্যে আশ্রয় খোঁজা ছিল পণ্ডশ্রমের নামান্তর; আমাদের বয়োবৃদ্ধি ঘটেছে এক ভয়াবহ অনাশ্রয়ে। যে বিশ্বের চিন্তা এবং মননের ক্ষেত্রে ফ্রয়েড এবং মার্কসের মতো মনীষী বিপ্লব সাধন করেছেন, সেই বিশ্বের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের ঔপনিষদিক জগতের সাযুজ্য কোথায়? আমরা তাই প্রেরণার উৎস খুঁজেছি পাশ্চাত্য দর্শনে, সমাজতত্ত্বে আর কাব্যে। ফলে এলিয়টের পোড়ো জমি হয়ে উঠেছে আমাদের বিচরণক্ষেত্র, আমরা কাব্যের পুঁজি বাড়াতে যত্নশীল হয়েছি এলুয়ার, আরাগঁ, লোরকা আর নেরুদার কাব্যভাণ্ডার থেকে সম্পদ আহরণ করে। আমরা ক্রমান্বয়ে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছি রবীন্দ্রনাথ থেকে।

কিন্তু সত্যিই কি বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছি? আমাদের কি কিছুই শিক্ষণীয় নেই রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকে? নেই, এরকম হঠকারী উচ্চারণ আমাদের কণ্ঠ থেকে নিঃসৃত হওয়া অসম্ভব। সত্য, রবীন্দ্রনাথ কোনোরকম দ্বন্দ্বে দীর্ণ না হয়েই ধ্রুব বলে জেনেছিলেন উপনিষদের তাত্ত্বিক আদর্শকে। এদিক থেকে দান্তে কিংবা গ্যয়টের সঙ্গে তাঁর কোনো মিল নেই। কোনো দার্শনিক তত্ত্বকে তাঁরা দ্বন্দ্বহীন চিত্তে গ্রহণ করতে পারেন নি। তবে আমরা যদি রবীন্দ্রনাথকে শুধু দ্যুলোক-ভূলোকময় জ্যোতিতে সমর্পিত, উপাসক কবি হিসেবে বিচার করি, তাহলে মারাত্মক ভুল করব। যদিও তিনি একসময় ফ্যাশিসট মুসোলিনির গুণকীর্তন করেছিলেন, তবু তাঁর প্রথম ধিক্কার উচ্চারিত হয়েছে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে। পৃথিবীর অশুভ পশুশক্তির দমন তিনি আকাঙ্ক্ষা করেছেন তার আত্মার পরিশুদ্ধির মাধ্যমে, কিন্তু এই পদ্ধতিতে হিংসার বিরুদ্ধে জয়লাভ করা সম্ভব নয়, এই সত্য তিনি উপলব্ধি করেন নি। যদি হিটলারকে তার আত্মার শোধনের সুযোগ দিয়ে মিত্রশক্তি হাত গুটিয়ে বসে থাকত তাহলে কি বিশ্বকে বাঁচানো যেত তার বেশুমার ট্যাঙ্কের চাকা থেকে, মারাত্মক বোমারু বিমান থেকে? যদি পালটা আঘাত না হানা যেত তাহলে রবীন্দ্রনাথের দার্শনিক আদর্শকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে হিটলার সারা বিশ্বকে মহাশ্মশানে রূপান্তরিত করে ক্ষান্ত হত। রাবীন্দ্রিক দর্শনের এই দিকটা অগ্রাহ্য করলেও আমাদের এই কথা অবশ্যমান্য যে, কবিসার্বভৌম কস্মিনকালেও অন্যায়ের পক্ষে কথা খরচ করেন নি। যিনি তাঁর অন্তরের এই অকৃত্রিম উপলব্ধি থেকে বলতে পারেন, "আমার এই চেতনার প্রবাহ পৃথিবীর প্রত্যেক ঘাসে এবং গাছের শিকড়ে শিকড়ে শিরায় শিরায় ধীরে ধীরে প্রবাহিত হচ্ছে, সমস্ত শস্যক্ষেত্র রোমাঞ্চিত হয়ে উঠছে, এবং নারকেলগাছের পাতা জীবনের আবেগে থরথর করে কাঁপছে।···ঐ ধুলো-মাটি-ঘাসের মধ্যে আমি হৃদয় ঢেলে দিয়ে গেলাম, বনস্পতি ওষধির মধ্যে। যারা মাটির কোলের কাছে আছে, যারা মাটির হাতে মানুষ, যারা মাটিতেই হাঁটতে আরম্ভ করে, শেষকালে মাটিতেই বিশ্রাম করে, আমি তাদের সকলের বন্ধু, আমি কবি"—তিনি শুধু প্রকৃতির সঙ্গেই লগ্ন নন, তাঁর অন্তরের যোগ বিশ্বমানবের সঙ্গেও। এই উচ্চারণের মধ্যে এক অতুলনীয় মানবিক ঔদার্যের ঊর্ধ্বচারী মানবাত্মার পরিচয় পাই। সব মানবের জন্যে কল্যাণকামনা, নিজের আনন্দ আর বিষাদকে যিনি সকলের আনন্দ আর বেদনায় মেশাতে পারেন, যিনি একটি জাতির নান্দনিক বিকাশের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রতিভূ হয়ে ওঠেন, তাঁর কাছে বারবার প্রত্যাবর্তন না করে আমাদের গত্যন্তর নেই।

রবীন্দ্রনাথের মহিমা অনুধাবন করতে হলে অগাধ পাণ্ডিত্যের প্রয়োজন নেই, আমাদের অভিজ্ঞতা আর বোধ থেকে আমরা বাঙালির জাতীয় জীবনে তাঁর বিপুল দানের কথা কবিসার্বভৌমের বিষয়ে কোনো গ্রন্থ পাঠ না করেও বলতে পারি—রবীন্দ্রনাথের হিমালয়তুল্য বিরাটত্ব এবং মাহাত্ম্যের কথা বাঙালি-মাত্রেরই জানা হয়ে গেছে এতদিনে, যদিও কেউ-কেউ ভক্তিবাদে আচ্ছন্ন হয়ে তাঁর কবিসত্তার চেয়ে ঋষি-সত্তাকেই বড়ো করে দেখেন। যে-দেশে গুরুবাদ আর অতীন্দ্রিয়বাদ সহজেই মানুষকে জীবনমুখী বস্তুবোধ থেকে দূরে সরিয়ে নিয়ে যায়, সে-দেশে এরকম হবে। এতে বিস্মিত হবার কিছু নেই। যা হোক, আমাদের জীবনে তাঁর উপস্থিতি নিসর্গের মতোই ব্যাপক এবং অনিবার্য। সর্ব বিষয়ে তাঁর সঙ্গে একমত না হয়েও তাঁকে আমরা আমাদের অস্তিত্বের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে পেয়ে যাই।

নানা কারণে রবীন্দ্রদর্শনের সঙ্গে আধুনিক মানুষের আত্মিক মিল নেই, এ কথা আগেই বলেছি। কিন্তু যে রবীন্দ্রনাথের মধ্যে দেশাত্মবোধের উন্মীলন লক্ষ করি, যে রবীন্দ্রনাথ সামাজিক অচলায়তনকে ভেঙে ফেলে মানবিক বোধের প্রসারে ক্ষান্তিহীনভাবে যত্নশীল, মানুষের সব রকমের সংকীর্ণতা-ক্ষুদ্রতা-দৈন্যের বিরুদ্ধে এক মহান প্রতিবাদ, সাম্রাজ্যবাদের অশুভ আগ্রাসন বিষয়ে সচেতন, এবং আমাদের মধ্যে বিশ্ববোধ জাগ্রত করে আমাদের চিৎপ্রকর্ষকে উন্নীত করার জন্যে তাঁর দীর্ঘ জীবনের অক্লান্ত সাধনা নিয়োজিত করেছেন, আমাদের জীবনবাদী এবং সৌন্দর্যপিপাসু করে তুলেছেন, সে রবীন্দ্রনাথকে আমরা অস্বীকার করব কী করে। তিনি শুধু শিল্পসৃষ্টি করে ক্ষান্ত হন নি, নিজের জীবনকেও শিল্পের মতো রচনা করেছেন। এজন্যই শ্রদ্ধেয় অন্নদাশঙ্কর রায় রবীন্দ্রনাথকে বলেছেন 'জীবন-শিল্পী'। আজ যখন আমাদের সমাজের সর্বক্ষেত্রে কুরুচির নোংরা দস্তবিকাশ আর স্থূলতার আস্ফালনে আমরা ভেতরে ভেতরে সেঁধিয়ে যাচ্ছি প্রায়, তখন প্রতিবাদী, জীবনশিল্পী রবীন্দ্রনাথের বড়ো প্রয়োজন আমাদের।

আমার কাব্যপ্রয়াস হয়তো পরিণামহীন, আমার কণ্ঠস্বর হয়তো অরণ্যে রোদনের শামিল, তবু আমার এই প্রয়াসে আমি রবীন্দ্রনাথের তুলনারহিত সাধনার কথা স্মরণে রাখি। তিনি অবিচল শ্রম ও নিষ্ঠায় তাঁর বিপুল রচনাসম্ভারে বাংলা সাহিত্যকে অসামান্য সমৃদ্ধ তো করেছেনই, আমাদের এই আঞ্চলিক সাহিত্যকে বিশ্ব-সাহিত্যের সঙ্গে যুক্ত করে দিয়েছেন নিজস্ব বিপুল বর্ণাঢ্য প্রতিভার গুণে। বিশ্বে বাঙালি জাতি যে সংকীর্ণমনস্ক বলে খ্যাত তার প্রায় ষোলো আনা কৃতিত্বই রবীন্দ্রনাথের।

এটা ঠিক, আমি কখনো রবীন্দ্রনাথের মতো লিখতে চেষ্টা করি নি, সেটা সম্ভবও নয়। রবীন্দ্রনাথের মতো লিখতে চাই নি কোনোদিন, এখনও চাই না। তবে একথা বলতে চাই, নিজের মঙ্গলের জন্য, কবিস্বশক্তির বিকাশের জন্য রবীন্দ্রনাথের কাছে বাঙালি কবিকে ফিরে যেতে হবে বারবার। এই প্রত্যাবর্তন পশ্চাদ্‌গামিতা বলে চিহ্নিত হবে না, বরং সামনে এগিয়ে যাওয়ার প্রবর্তনা হিসেবে স্বীকৃত হবে। রবীন্দ্রনাথের অপরিমেয় সৃষ্টিভাণ্ডারে আমরা হাত বাড়াব অনুকরণস্পৃহায় নয়, সেই সম্পদকে সুদাসলে খাটিয়ে নেওয়ার তাগিদে, নতুন সৃষ্টির প্রেরণায়।

আমি সবরকম গোঁড়ামির বিরুদ্ধে। তাই, এই চৈতন্যদেবের দেশে যারা রবীন্দ্রনাথকে বিগ্রহ বানিয়ে ধেই-ধেই নৃত্য করেন, অন্ধ গোঁড়ামিকে প্রশ্রয় দেন, তাঁদের কর্মকাণ্ডের প্রতি সায় দিতে কিছুতেই মন সরে না। তা বলে এ-কথা কেউ ভাববেন না যে আমি রবীন্দ্রনাথকে শ্রদ্ধা করি না। আমাদের প্রজন্মের কবিদের একটা বদনাম আছে যে আমরা রবীন্দ্রনাথকে বিশেষ আমলে আনতে চাই না। একথা ঠিক নয়। রবীন্দ্রনাথের ঔপনিষদিক অধ্যাত্মবাদের কাছে আত্মসমর্পণ আমরা করি নি, কিন্তু তাঁর অতুলনীয় কল্যাণব্রত এবং বিশ্ববোধের সামনে আমরা নতজানু, তবে কারো চরণধুলার তলে মাথা নত করে দেওয়া আমাদের ধাতে নেই। আমাদের প্রজন্মের শঙ্খ ঘোষ তো তাঁর জীবনের বেশকিছু অংশ রবীন্দ্র-চর্চায় নিয়োজিত করেছেন স্মরণীয়ভাবে। অলোকরঞ্জন দাশ-গুপ্ত বা আলোক সরকারও রবীন্দ্রপ্রেমিক। এবং এটা আমি বারবার লক্ষ করেছি, তুমুল নৈশ আড্ডায় শক্তি চট্টোপাধ্যায় আর সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের কণ্ঠে গানের যে

উন্মাতাল ঝরনাধারা বয়ে যায়, তা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই রবীন্দ্রনাথেরই গান। আমাদের বাংলাদেশেও আমার এবং আমার সমবয়সীদের, এমনকি আমার কনিষ্ঠ সহযাত্রীদের মধ্যেও রবীন্দ্রনাথের উজ্জ্বল উপস্থিতি, একটু ভিন্ন অর্থে, সূর্যের মতোই দেদীপ্যমান। তাঁর অলোকসামান্য ঋণ অস্বীকার করব, এমন অকৃতজ্ঞতা যেন আমাদের কখনো গ্রাস না করে।

সত্যের অনুরোধে বলা দরকার, রবীন্দ্রনাথের সব কবিতার প্রতি হয়তো আমরা তেমন সাড়া দিই না, দিতে পারি না, কিন্তু গীতবিতানের পাতায় পাতায় তিনি আমাদের জন্য ছড়িয়ে রেখেছেন অশেষ বিস্ময়, অরূপরতন তার সম্মোহন কখনো কাটবে বলে মনে হয় না। আমি রবীন্দ্রনাথের বহুমুখী সৃষ্টিপ্রাচুর্যের কথা বিস্মৃত হই নি, বিস্মৃত হই নি অন্যান্য ক্ষেত্রে তাঁর অসামান্য কীর্তির কথা; কিন্তু আমার বিশ্বাস, 'গীতবিতানে' যে কবি গানের অবিনাশী লীলা সৃষ্টি করেছেন তাঁর পরিচয় রবীন্দ্রনাথের অন্যান্য পরিচয়কে ছাপিয়ে উঠেছে, এবং আমি এমন উক্তি করতে প্রলুব্ধ হচ্ছি যে 'মানসী', 'সোনার তরী', 'চিত্রা', 'কল্পনা' থেকে শুরু করে 'বলাকা', 'পূরবী', 'মহুয়া', 'পুনশ্চ', 'শ্যামলী' প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থের যিনি রচয়িতা, তার চেয়ে মহত্তর কবি 'গীতবিতানে'র সৃষ্টিকর্তা।

অক্ষম আমি, আধুনিক যুগের এক অস্থিরচিত্ত, বিপন্ন মানুষ, আমার জীবনকে শিল্পের মতো রচনা করতে পারি নি। নানা ঘানাবন্দে পড়ে প্রচুর কাদামাটি লেগেছে আমার সত্তায়, জীবিকার রন্ধ্র দিয়ে ঢুকে আমাকে কখনো-কখনো স্পর্শ করেছে পদে পদে, বিঘ্নিত হয়েছে আমার সৌন্দর্যসাধনা। এতৎসত্ত্বেও যে আমি কাব্যসৃষ্টিকে আমৃত্যু এক নিরবচ্ছিন্ন, ক্ষমাহীন সংগ্রাম বলে জেনেছি, সর্বপ্রকার সংকীর্ণতা আর ক্ষুদ্রতাকে লঙ্ঘন করবার যে প্রয়াস আমার মধ্যে জাগ্রত, প্রাকৃতিক সৌন্দর্য উপভোগের যে-তৃষ্ণা আমাকে বাঙলার ষড়্‌ঋতুর বৈচিত্র্যময় রূপের প্রতি উন্মুখ করে রাখে, সকল দেশের সকল মানুষকে ভালোবাসার সে আকাঙ্ক্ষা আমার অন্তরে দৃঢ়মূল, তার অনেকটাই নিঃসন্দেহে রবীন্দ্রনাথের দান। মানুষ হিসেবে আমি নগণ্য এবং শোচনীয়ভাবে অসম্পূর্ণ; তবু মনুষ্যত্ব রক্ষা করাই যে মানুষের নিরন্তন সাধনা, জীবনের অন্তিম মুহূর্ত পর্যন্ত যাতে প্রকৃত মানুষ হয়ে বেঁচে যেতে পারি, নিজের মধ্যে সৌন্দর্যবোধকে উদ্দীপ্ত রেখে তা অন্যের চেতনায় সঞ্চারিত করতে পারি—একজন মানুষের পক্ষে জরুরি আর উপকারী এই বিষয়গুলিও কি আমি রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকে শিখে নিই নি? যিনি সভ্যতার সংকটে বিচলিত হয়ে বলতে পারেন 'মানুষকে বিলুপ্ত করে যদি মানুষের মুক্তি, তবে মানুষ হলুম কেন', তাঁর কাছ থেকে পাঠ নেওয়া কখনো শেষ হবার নয়। রবীন্দ্রযুগ থেকে আমরা আজ অনেক দূর সরে এসেছি, কিন্তু সভ্যতা আজও সংকটমুক্ত হতে পারে নি, বরং এখন মানবসভ্যতার সবচেয়ে চরম সংকটকাল। এ ধরনের সংকটকাল মানবজাতি এর আগে অতিক্রম করে নি, এ-ব্যাপারে সকল সচেতন মানুষই একমত। পারমাণবিক যুদ্ধের মুখোমুখি বসবাস করছি আমরা, যদি এই যুদ্ধ কোনো উন্মাদের প্ররোচনা কিংবা অশুভ উদ্যোগে বেধে যায়, তাহলে গোটা মানবজাতি আমাদের এই প্রিয় গৃহ থেকে বিলুপ্ত হয়ে যাবে। তাই, রবীন্দ্রনাথের এই প্রশ্ন: 'মানুষকে বিলুপ্ত করে যদি মানুষের মুক্তি, তবে মানুষ হলুম কেন'—প্রতিটি সভ্য মানুষের মনে জাগরূক থাক। যদি থাকে, তাহলে হয়তো মানবজাতি বিলুপ্তির গ্রাস থেকে রক্ষা পাবে। মানুষকে বিলুপ্ত করে মুক্তিসন্ধান নয়, তাকে বাঁচিয়ে রেখে সৃজনশীল, কল্যাণকামী ও প্রগতিশীল করে গড়ে তুলে মানুষের মুক্তিপ্রচেষ্টা অব্যাহত থাক।

পটভূমি

নির্মলকুমার দাস

তবে কি এই প্রখর রৌদ্রতপ্ত ঝাঁ-ঝাঁ দুপুরটাও শেষ পর্যন্ত ধুঁকতে-ধুঁকতে মৃত্যুর মতো নিষ্প্রাণ, নিথর হয়ে পড়ল। হিমাংশু আন্দাজ নিল, সদ্যোমৃত মানুষের শারীরিক উত্তাপ দেখে যেমন মনে হয় এখনো ধমনীতে রক্ত পুরোদমে প্রবহমান, বুঝি-বা হৃদ্‌যন্ত্র সম্পূর্ণ ক্রিয়াশীল, কিন্তু আসলে সব শেষ, নিষ্প্রাণ, এক শুষ্ক কঠিন শীতলতায় আবৃত—ঠিক তেমনই। হিমাংশু নিদারুণভাবে উপলব্ধি করল, উত্তপ্ত হলেও দুপুরটা আসলে মৃত, ভয়ংকর রকমের স্পন্দনহীন। সঙ্গে-সঙ্গে সে টের পেল, একটা ভয়াবহ নিস্তব্ধতা শকুনের মতো বিশাল ডানা মেলে নেমে এসে তার চারপাশে জমতে শুরু করেছে। এবং তারপর ওই নিস্তব্ধতা থেকে উদ্ভূত এক মৃত্যুজনিত ভয় চোখের সামনে দিয়েই তার শরীরে প্রবেশ করে রক্তে মিশে দ্রুতবিস্তারী বন্যার মতো ছড়িয়ে পড়তে লাগল। সঙ্গে-সঙ্গে গা ঝাড়া দিয়ে উঠল সে, দুমড়ে-মুচড়ে দলা পাকিয়ে ভয়টাকে কাগজের গিণ্ডের মতো জানলা দিয়ে বাইরে ছুঁড়ে ফেলে দিতে চাইল—পারল না।

'ঘুমোচ্ছেন নাকি!'

গলার স্বরেই হিমাংশু বুঝল, সোমনাথ। টেবিল থেকে মাথাটি তুলে সোমনাথের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকল সে। তার চোখদুটো এখন ঠিক জলে ভাসমান মৃত মাছের চোখের মতো স্থির, কিছুটা ঘোলাটে। ফ্যাল-ফ্যাল করে সোমনাথের দিকে সে তাকিয়েই থাকল, এবং এইরকম অস্বাভাবিকভাবে তাকে তাকিয়ে থাকতে দেখে সোমনাথ খানিকটা অপ্রস্তুতের মধ্যে পড়ে ভীষণ বিব্রত বোধ করতে লাগল।

'ডিসটার্ব করলাম তো!'

সম্বিত ফিরে পেল হিমাংশু, বুঝতে পারল, জীবন থেকে মুহূর্তের জন্যে কোথাও যেন হারিয়ে গিয়েছিল সে।

'না না, ঘুম-টুম কিছু নয়। এমনি—'

'তাহলে নিশ্চয়ই ভাবছিলেন কিছু একটা!'

সরু চোখে হিমাংশু তাকাল সোমনাথের দিকে। পাতলা হাসি লেগে আছে ওর ঠোঁটে।

'না না, ভাবনা-টাবনা কিছু নয়।'

তবে কি ও কিছু টের পেয়েছে?

'আচ্ছা, তুমি ভাবনার কথা তুললে কেন সোমনাথ?'

সোমনাথ আবার অপ্রস্তুতের মধ্যে পড়ে গেল।

'আপনাকে কেমন গম্ভীর-গম্ভীর দেখাচ্ছে, তাই বললাম। কিছু মনে করবেন না। শুনুন যেজন্যে এসেছিলাম—ওপরে যাচ্ছেন তো বিকেলে?'

'কেন বলো তো?'

'বাঃ, ভুলে গেলেন এর মধ্যে! কাল যে বলে গেলাম অত করে।'

কয়েক মুহূর্ত প্রাণপণ স্মৃতি হাতড়ে বেড়ায় হিমাংশু, তারপর হঠাৎই সামনের দেয়ালে ঝোলানো 'হিরোসিমা দিবস' পোসটারটি চোখে পড়তেই যেন পরিত্রাণ পায় সে এমনভাবে বলে ওঠে, 'ও, আচ্ছা আচ্ছা, মনে পড়েছে। হ্যাঁ হ্যাঁ, নিশ্চয়ই যাব।'

'ভুলবেন না কিন্তু' বলে, একই অনুরোধ নিয়ে সোমনাথ চলে গেল অন্য টেবিলের দিকে, এবং হিমাংশু একদৃষ্টে ওর গমনপথের দিকে তাকিয়ে থাকতে-থাকতে উপলব্ধি করল, তার শরীরে রক্তচলাচলের গতি ক্রমশ কমে আসছে, একটা নিস্তেজ ভাব তার শরীর জুড়ে গভীরভাবে শিকড় ছড়িয়ে গেঁথে বসে তার প্রাণশক্তি শুষে নিচ্ছে, এবং সে আস্তে-আস্তে, ধুঁকতে-ধুঁকতে নিষ্প্রাণ, নিথর হয়ে পড়ছে—ঠিক এই স্পন্দনহীন দুপুরের মতো। তবু সে তার ভীষণ ভারি মাথাটি তুলে, প্রাণপণ চেষ্টায় স্থির রেখে চারদিকে ভালো করে তাকিয়ে উপলব্ধি করার চেষ্টা করল, দুপুরটা সত্যিই মৃত কিনা। আপাতদৃষ্টিতে কোনো তফাত খুঁজে পেল না সে, তবে কোথায় যেন একটা গরমিল আছে, সেটা সে টের পেল। এবং একসময় নিজের অস্তিত্ব নিয়ে চরম সংশয় দেখা দিতে আবার ভালো করে চারদিকে তাকাল। এখন টিফিন। তার সহকর্মীরা এদিক-ওদিকে অলস ভঙ্গিতে সময় কাটাচ্ছে, টাইপমেশিনে অবিরাম শব্দ নেই, কিছুক্ষণের জন্যে রেহাই পেয়ে মেশিনগুলো হাঁফাচ্ছে…সবকিছুই দেখছে হিমাংশু, কিন্তু তার মনে হচ্ছে সব যেন অস্বচ্ছ, জলে ডুব দিয়ে চারপাশে তাকালে যেমন দেখায়—ঠিক তেমন। তবে কি আমি—

না।

তলিয়ে যেতে-যেতে এক প্রবল টানে সে যেন আবার ওপরে ভেসে উঠে হাঁপ ছেড়ে বুক ভরে বাতাস টেনে নিশ্চিন্ত হল—না, আমি মারা যাই নি। তবে যে-কোনো দিন, যে-কোনো মুহূর্তে মারা যেতে পারি। এই যেমন আজ সকালে ওই লোকটার বদলে আমিই মারা যেতে পারতাম। ভাবনাটি অনিবার্যভাবে তার মাথায় কিলবিল করে ঘুরে বেড়াতেই অপরিচিত সেই লোকটির মৃত, থ্যাঁতলানো মুখটি যেন মৃত্যুর ভয়াবহতা সম্পর্কে তাকে সচেতন করতে তার চোখের সামনে স্পষ্ট হয়ে উঠল। এবং ভয়ে, এই নিদারুণ গ্রীষ্মে হি-হি করে কাঁপতে লাগল সে। অথচ এমন নয়, জীবনে এই প্রথম মৃত্যু প্রত্যক্ষ করল হিমাংশু। বছর কয়েক আগে তার বাবা দীর্ঘদিন রোগের সঙ্গে, মৃত্যুর সঙ্গে প্রাণপণ যুদ্ধ করতে-করতে অবশেষে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছেন। তবে অনস্বীকার্যভাবেই মৃত্যুর ভূমিকা সেখানে ছিল ভিন্ন। মাঝখানে তার বাবাকে রেখে জীবন আর মৃত্যুর মধ্যে এক প্রবল যুদ্ধ চলেছিল দীর্ঘদিন ধরে। মাঝে-মাঝে, খুবই কাছ থেকে মৃত্যুর ভয়াবহ উপস্থিতি টের পেয়েছে সে অনেক দিন। কোনো-কোনো দিন রোগশয্যায় শায়িত বাবাকে আকস্মিকভাবে বিছানায় উঠে বসে থাকতে দেখে তার মনে হয়েছে, সাময়িক রেহাই দিয়ে মৃত্যু যেন পাশের ঘরে পরম নিশ্চিন্তে বিশ্রাম করছে। এইভাবে দিনের পর দিন যেতে-যেতে মৃত্যু সম্পর্কে তার একটা স্পষ্ট ধারণা গড়ে উঠেছিল, এবং ক্রমে মৃত্যুভয় তার জীবনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে মিশে গিয়েছিল। বিছানার সঙ্গে মিশে জীবনের শেষ স্পন্দনটুকু বুকে নিয়ে ধুকপুক-করে-কোনোক্রমে-বেঁচে-থাকা বাবাকে দেখে তার মাঝে-মাঝেই মনে হত—বাবা আসলে মৃত। তবু অফিস থেকে ফিরে, বাবার আসন্ন মৃত্যুকে মেনে নেওয়ার সেই প্রস্তুতিপর্বে, বাবা আর কোনোদিনও ভালো থাকবেন না—এই নির্মম সত্য নিশ্চিতভাবে জেনেও সে প্রতিদিন জিজ্ঞাসা করত, 'আজ কেমন আছেন, বাবা?'

তার বাবা বিকল-হওয়া যান্ত্রিক পুতুলের মতো নিশ্চল, এমনভাবেই বিছানায় পড়ে থেকে ঘোলাটে হতাশ চোখে বেশ কিছুটা সময় ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকতেন তার দিকে, তারপর অসহায়ভাবে সম্পূর্ণ এক অপরিচিত গলায় বলতেন, 'ভালো।'

সেও ধৈর্য ধরে অধীর আগ্রহে বাবার কণ্ঠস্বর শোনার জন্যে অপেক্ষা করে থাকত। আসলে অভিজ্ঞতা দিয়ে হিমাংশু জেনে গিয়েছিল, বাবা আর কোনোদিনই প্রশ্নের সঙ্গে-সঙ্গেই উত্তর দিতে পারবেন না। কেননা জীবন থেকে তিনি ক্রমশ মৃত্যুর গহ্বরে ডুবে যাচ্ছেন। জীবন থেকে ছুঁড়ে-দেওয়া শব্দসমূহ সেই অতল গহ্বরের শূন্যতা ভেদ করে ডুবন্ত বাবার কানে গিয়ে পৌঁছতে, এবং জীবনীশক্তি-নিঙড়ে-নিঙড়ে-দেওয়া বাবার উত্তর সেই গহ্বর থেকে ওপরে উঠে এসে বুদবুদের মতো ফেটে পড়তে ঢের সময় লাগবে, এবং সময়ের এই দূরত্ব রোজই একটু-একটু করে বেড়ে যেতে থাকবে অনিবার্যভাবে। এইভাবেই, সেই একই প্রশ্ন এবং উত্তরের মধ্যবর্তী সময়ের দূরত্বটি বাড়তে-বাড়তে একদিন হঠাৎ ছিঁড়ে, যোগসূত্রহীন হয়ে পড়ল। সেই গহ্বরে বাবা তলিয়ে গেলেন, হারিয়ে গেলেন চিরদিনের মতো। জীবনের শব্দ, স্পন্দন আর কোনোদিন সেখানে পৌঁছবে না, কোনোদিনও না। বাবা মানে এখন শুধু স্মৃতি।

যন্ত্রণাদীর্ণ শরীরটা বিছানার সঙ্গে লেপ্টে শুয়ে থেকে মাঝে-মাঝেই তার বাবা ঘোলাটে উদাস চোখে শূন্যে চেয়ে থাকতেন। চোখের মণি দুটি একই জায়গায় স্থির। ক্ষীণ দৃষ্টি; তবু অমন নিবিষ্ট হয়ে একদৃষ্টে চেয়ে-চেয়ে কী দেখতেন তিনি? হিমাংশুর জিজ্ঞাসার উত্তরে মৃত্যুর কয়েকদিন আগে উনি বলেছিলেন, 'ছবি'।

'ছবি?'

'মারা যাবার আগে মানুষ তার জীবনের কিছু-কিছু ছবি দেখতে পায়। সেইরকমই কিছু ছবি দেখছি, বাবা।'

আচ্ছা, ওই লোকটি কি মৃত্যুর অতর্কিত আক্রমণে, সাম্রাজ্যবাদী হানায় স্মৃতিচিহ্নিত ধ্বংসাবশেষের মতো রাস্তায় পড়ে যাওয়ার আগে তার জীবনের কোনো ছবি দেখতে পেয়েছিল?

'চা।'

যেন পৃথিবী কাঁপিয়ে বাজ পড়ল, এমনভাবেই চমকে ধড়ফড় করে জেগে উঠে হিমাংশু দেখল, প্লেটে উপুড়-করে-রাখা কাপটি তুলে ক্যানটিনের সতীশ চা ঢালছে। তার মানে টিফিনের সময় শেষ হয়ে গেছে অনেকক্ষণ। চারপাশে এখন যন্ত্রচালিত কর্মব্যস্ততা। সমবেত চিৎকার থেকে একটা হৈ হৈ রব সারাটা অফিস জুড়ে ধ্বনি-প্রতিধ্বনির মাধ্যমে ক্রমশ বিস্তারিত হচ্ছে। অথচ আমি কেমন তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিলাম। ঘুম এসেছিল, না-কি মৃত্যু? সে নড়েচড়ে বসল। সতীশ চা দিয়ে চলে গেল অন্য টেবিলে।

হিমাংশু নিশ্চল। পাথরের মতো স্থির হয়ে টেবিলে রাখা চায়ের কাপটির দিকে একদৃষ্টে চেয়ে থেকে ভাবতে লাগল—এমন তো হতে পারত—আজ সারাটি দিন টেবিলের ওপর প্লেটে ওই চায়ের কাপটি উপুড় হয়ে পড়েই থাকত। আমি আসি নি দেখে সতীশ কাপটি তুলতই না। হয়তো চা দিতে এসে আমাকে দেখতে না পেয়ে হালদারবাবুকে জিজ্ঞাসা করত আমি এসেছি কিনা।—আসি নি। না আসার চূড়ান্ত কারণটা নিশ্চয়ই কারো মাথায় আসত না, যেন আমি মারা যেতে পারি না। আচ্ছা, যদি আজ আমি অফিসে বেরিয়েও পৌঁছতে না পারতাম, যদি ও লোকটির বদলে আমিই থেঁতলে চুরমার হয়ে পড়ে থাকতাম রাস্তায়, তাহলে কি শেষবারের মতো আমার চোখের সামনে আমার জীবনের কোনো ছবি ফুটে উঠত? ভাবতে-ভাবতে হিমাংশু ভীষণ বিপন্ন বোধ করল। এবং সে একান্তভাবেই চাইল, এই বিপন্ন সময়ে তার পাশে তার স্ত্রী-পুত্র এসে দাঁড়াক। এই

সান্নিধ্যটুকুর জন্যে ভীষণ প্রত্যাশী হয়ে উঠল সে, যেন এটা এই মুহূর্তে কাম্য, অপরিহার্য। মনে-মনে স্ত্রীর উদ্দেশে হিমাংশু বলল, 'আজ ভীষণ একটা ফাঁড়া গেল, রানু। খুব বাঁচা বেঁচে গেছি আমি।' পরমুহূর্তেই থমকে আবার ভাবল—ফাঁড়াটা কি সত্যিই গেছে? ভাবতে-ভাবতে ভীষণ অসুস্থ বোধ করল সে। প্লেট দিয়ে চায়ের কাপটি ঢেকে বাথরুমে চলে গেল। কল সম্পূর্ণ খুলে অনেকক্ষণ ধরে চোখে-মুখে ভালো করে জল দিল, যেন জল দিয়ে মুখমণ্ডলে মৃত্যুভয়ে প্রকট হয়ে ওঠা বলিরেখাগুলি ধুয়ে-মুছে সাফ করে দিতে চাইল। অনেকক্ষণ ধরে বেসিনের ওপর মুখ নীচু করে জলের ঝাপটা দেওয়ার পর মুখ তুলে আয়নায় তাকাতেই বড়ো আশ্চর্যভাবে হিমাংশু দেখল, তার মুখ আয়নায় নেই, বদলে একটা ধ্যাঁতলানো, রক্তাক্ত বিকৃত মুখ বীভৎসভাবে প্রতিবিম্বিত হচ্ছে। কার মুখ? সেই লোকটির? সেই লোকটির জীবন্ত মুখ তবে কেমন ছিল? সঙ্গত কারণেই হিমাংশু সেই লোকটির জীবন্ত মুখটি খুঁজে পেল না। লোকটি তার পাশে দাঁড়িয়ে থাকলেও তার প্রাণহীন দেহটাই সে দেখেছে। কোনো জীবন্ত মানুষের মুখের সঙ্গে ওই ধ্যাঁতলানো বিকৃত মুখটির কোনো মিল নেই। অর্থাৎ, থেঁতলে-পিষে-যাওয়া ওই মুখটি আমারও হতে পারত—পারে। এইভাবে আড়াল থেকে চুপি চুপি দিয়ে সে যেন নিজেরই মৃত, ধ্যাঁতলানো মুখটি দেখতে লাগল। এবং এক নির্মম সত্যের মুখোমুখি হয়ে এক ভয়ংকর আশঙ্কার গহ্বরে হু হু করে তলিয়ে যেতে লাগল। তার দম বন্ধ হয়ে আসতে লাগল, একটা অবলম্বনের জন্যে সে চারপাশে আকুলভাবে হাতড়াতে লাগল, ডুবন্ত মানুষের প্রাণপণ চেষ্টায় মাথা ঠেলে ওপরে ভেসে উঠতে চাইল। ভারি মাথাটি ঝুঁকিয়ে আবার নিয়ে গেল বেসিনের মধ্যে, প্রচুর জলের ঝাপটা দিল আবার। তারপর অত্যন্ত ক্লান্তভাবে পকেট থেকে রুমাল বের করে মুখ মুছে, টলতে-টলতে নিজের টেবিলে ফিরে এল। চায়ে চুমুক দিয়ে দেখল ঠাণ্ডা—মৃত্যুর মতো শীতল। সকাল থেকেই হিমাংশু আজ কাজে মন বসাতে পারছে না। এবং সে প্রায় নিশ্চিতভাবে জেনে গেছে, হাজার চেষ্টা করেও আজ আর কোনো কাজে মন বসাতে পারবে না সে। কোনো দিনই কি আর পারবে? অথচ শিরা-উপশিরায় মস্তিষ্কে আশ্চর্য দ্রুততায় ছড়িয়ে-পড়া মৃত্যুভয়ের হাত থেকে রেহাই পেয়ে আজ, এখন, এই মুহূর্তেই তার ভীষণভাবে কাজে ডুবে যাওয়া একান্তই জরুরি। কিন্তু হিমাংশু নিরুপায়। ভয়ে, আশঙ্কায়। অস্থিরতায় ভীষণভাবেই কেঁপে-কেঁপে উঠছে সে। ভীষণ শীত করতে লাগল তার ভিতরে-ভিতরে—ভীষণ।

বেশ কিছুটা তফাতে সোমনাথের টেবিল। হিমাংশু ঈর্ষার চোখে দেখল, মুখ নীচু করে গভীর অভিনিবেশের সঙ্গে সোমনাথ কাজ করে চলেছে।

উশখুশ করতে-করতে সে একসময় নিরুপায় হয়ে উঠে পড়ল। পায়ে-পায়ে ওর কাছে গিয়ে দাঁড়াতে সোমনাথ মুখ তুলল, 'কিছু বলবেন?'

'না, তেমন কিছু নয়। এই এলাম তোমার কাছে একটু।'

'বলুন।'

একটা চেয়ার টেনে হিমাংশু বসে পড়ে।

'কী এত কাজ করছ মন দিয়ে?'

'আর বলবেন না। অ্যাকাউন্টসের ঝামেলা আমাকে পোহাতে হচ্ছে। আমি ভেবে দেখেছি বুঝলেন, অ্যাকাউন্ট্স্ আর পুলিশের চরিত্র পৃথিবীর সর্বত্র একেবারে এক। কোনো উনিশ-বিশ নেই।

হিমাংশু সহজভাবে হাসবার চেষ্টা করল, পারল না। তার হাসিখানা মাঝপথে ভেঙেচুরে বানখান হয়ে কেমন একটা উদ্ভট শব্দে পরিণত হল। আশেপাশে তাকাল সে, যেন বুঝবার চেষ্টা করল তার এই অস্বাভাবিক অবস্থাটা কেউ প্রত্যক্ষ করছে কিনা। তারপর একসময় এক চরম অস্থিরতায় ছটফট করতে-করতে নীচু গলায় বলল, 'আচ্ছা সোমনাথ—'

ফাইলে মুখ গুঁজেই সোমনাথ বলল, 'বলুন—'

কিন্তু কিভাবে প্রসঙ্গটি আনবে এই নিয়ে মহা সংকটে পড়ে গেল সে। যেন শব্দগুলি, কথাগুলি নাভিমূল থেকে উঠে এসে গলায় আটকে আছে, অনেক চেষ্টা করে ধাক্কা দিয়ে-দিয়ে বের করতে হচ্ছে,—একসময় এমনই শোনাল তার কণ্ঠস্বর, 'ধরো, তুমি সকালবেলায় খেয়ে-দেয়ে বাড়ি থেকে বের হলে, কিন্তু অফিসে এলে না—'

'আরে, এমন তো আমার আগে প্রায়ই হত—' সোমনাথ প্রায় লাফিয়ে উঠল, 'বাড়ি থেকে ঠিকই বের হলাম, বাসেও উঠলাম, কিন্তু শিয়ালদা আসতেই একেকদিন বাস থেকে নেমে পড়তাম। তারপর লোকাল ট্রেন ধরে কোথাও না কোথাও চলে যেতাম। আবার কোনো-কোনো দিন ডালহৌসিতে নেমে অফিসের দোরগোড়ায় পৌঁছেও অফিসে ঢুকি নি। বন্ধুর অফিসে চলে যেতাম। তারপর আড্ডা, কী কোনদিন নুন শো—এমনই হত। কিন্তু কী বলব জানেন, সেইসব ইচ্ছেগুলো কবন যে কিভাবে মরে গেল, কিভাবে যে একটা একঘেয়ে জীবনের সঙ্গে নিজেকে বেঁধে ফেললাম, তা নিজেই টের পেলাম না। আপনার এখনো হয় নাকি এরকম?'

'না না, আমি ঠিক তা বলছি না। আমি বলতে চাইছি—তুমি অফিসে এলে, সারাদিন দিব্যি কাজ করলে, তারপর ছুটির পর বাড়ি রওনাও দিলে—কিন্তু ধরো বাড়িতে আর তুমি ফিরতে পারলে না। কোনোদিনই না—'

'—মানে?' সোমনাথ প্রায় আঁতকে ওঠে।

'মানে তুমি মারা গেলে।'

'মারা গেলাম!'

সোমনাথ স্তম্ভিত হয়ে হিমাংশুর দিকে একদৃষ্টে চেয়ে থাকতে-থাকতেই এই বিষয়ের প্রাসঙ্গিকতা ভীষণ একাগ্র হয়ে খুঁজে পেতে চেষ্টা করল। তারপর অবাক গলায় জিজ্ঞাসা করল, 'কী ব্যাপার বলুন তো?'

হিমাংশু অপ্রস্তুতের মধ্যে পড়ে গেল, কিভাবে প্রসঙ্গটি টেনে নিয়ে যাবে তা নিয়ে দ্রুত ভাবতে লাগল।

'তুমি কিছু মনে কোরো না। আসলে আমি বলতে চাইছি, মানে……আচ্ছা তোমার কি মনে হয় না সোমনাথ যে, তুমি, আমি—আমরা সবাই যে-কোনো সময় যে-কোনো ভাবে মারা যেতে পারি?'

'তা তো যেতেই পারি। অ্যাকসিডেন্ট হতে পারে—'

'—হ্যাঁ, হ্যাঁ—'

'কিংবা দুদলে মারামারি হচ্ছে, কি পুলিশের গুলি চলছে, আপনি মাঝখানে পড়ে গেলেন, কিংবা জানা নেই শোনা নেই—বাংলাদেশে যে সাইক্লোনটা হয়ে গেল, কিংবা ভূপালের ঘটনাটাই ধরুন না। কিন্তু আজ হঠাৎ আপনি এসব ভাবতে শুরু করলেন কেন বলুন তো?'

হিমাংশু কোনো উত্তর দিল না, না দিয়ে ভীষণ অস্থিরভাবে পালটা প্রশ্ন করল, 'ভয় করছে না তোমার সোমনাথ? এই যে আমরা যেকোনো সময়েই মারা যেতে পারি, এটা ভেবে তোমার ভয় করছে না একটুও?'

'ভেবে বা ভয় পেয়ে কী লাভ বলুন, এসব নিয়েই তো জীবন।'

সোমনাথ আমার কথা, মৃত্যুর ভয়াবহতা উপলব্ধি করতে পারল না। সে বাংলাদেশ আর ভূপালের ঘটনা কাগজে পড়েছে, আমার মতো মৃত্যুকে ছোঁ মেরে একটি জীবন তুলে নিতে স্বচক্ষে দেখে নি, একটি মানুষকে নিমেষের মধ্যে ডেডবডি হয়ে নিরুপায়ভাবে রাস্তায় পড়ে থাকতে দেখে নি। মৃত্যুকে আমি আমার কানের পাশ দিয়ে সাঁ করে ছুটে চলে যেতে দেখেছি।

হিমাংশু বিমর্ষ হয়ে পড়ল। তার উদ্বেগ বাড়তে লাগল। সে নারভাস হয়ে পড়ল। কয়েক মুহূর্ত ইতস্তত করতে-করতে একসময় 'চলি' বলে হতাশ হয়ে উঠে পড়ল। যেন সে ভেবেছিল, মনেপ্রাণে বিশ্বাস করেছিল, তার কথা শুনে সোমনাথও তার মতো মৃত্যুভয়ে আচ্ছন্ন হয়ে পড়বে।

নিজের টেবিলের সামনে এসে, দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়েই সে ঢকঢক করে জল খেল, তারপর ঘুরে চেয়ারে বসতেই সামনের দেয়ালে ঝোলানো 'হিরোসিমা দিবস' লেখা

পোস্টারটিতে তার চোখ বিঁধে গেল, আর সঙ্গে-সঙ্গেই মনে পড়ে গেল—চল্লিশ বছর আগে থেকে এই গ্রহেরই হিরোসিমা নাগাসাকি নামে দুটি জায়গা মৃত্যুর মধ্য দিয়ে সভ্যতার বুকে দুটি স্বাতন্ত্র্যচিহ্নিত ক্ষত হয়ে আছে অনন্তকালের জন্যে। কত মানুষ মারা গেছে হিরোসিমা-নাগাসাকিতে, কত?

'হিরোসিমা দিবস' নামে যে সভা আজ বিকেলে চারতলার এই প্রশস্ত হলঘরে ডাকা হয়েছে, সময়মতো সেখানে হাজির হয়ে হিমাংশু দেখল, সেই সভা শুরু হতে এখনো দেরি আছে। ছুটির পর বেশিরভাগ লোকই চলে গেছে। ফলে এত বড়ো বাড়িটি কেমন যেন প্রাণহীন, নিস্পন্দ। হলঘরের দেয়াল ঘেঁষে একটি ছোটো মঞ্চ, মঞ্চে একটা ফেস্টুন—'যুদ্ধ নয়, শান্তি চাই।' কয়েক মুহূর্ত ফেস্টুনটির দিকে একদৃষ্টে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকার পর হিমাংশু হলঘর থেকে বেরিয়ে লাগোয়া ছাদে চলে এল। সামনেই গঙ্গা, যেন হাত বাড়ালেই ছোঁয়া যায়। ডানদিকে কোনাকুনি হাওড়া ব্রিজ। একটা যাত্রীবাহী লনচ মন্থরগতিতে ওপারে চলে যাচ্ছে। নীচে স্ট্র্যানড রোড। পুরনো দিনের বিলডিং। চারতলা মানে অনেক উঁচু। এত উঁচু ছাদে পাঁচিল ঘেঁষে দাঁড়িয়ে দেহের কিছুটা অংশ ভ্রূক্ষেপহীন আর বিপজ্জনকভাবে বাইরে নিয়ে ঝুঁকে সে নীচে, রাস্তার দিকে তাকাল। অসংখ্য গাড়ি যাতায়াত করছে। উঁচু থেকে দেখছে বলেই তার মনে হচ্ছে ভীষণ আস্তে-আস্তে যাতায়াত করছে গাড়িগুলি, যেন আড়াল থেকে কেউ তাদের গতি নিয়ন্ত্রণ করছে। স্থাণুর মতো দাঁড়িয়ে অভিনিবেশের সঙ্গে হিমাংশু নীচের গাড়ি-চলাচল পর্যবেক্ষণ করতে-করতে একসময় ভাবল—আমি যদি আরো কয়েকতল ওপরে উঠে যাই, তাহলে নিশ্চয়ই মনে হবে গাড়িগুলি ছুটছে না, হাঁটছে। যদি আরো ওপরে উঠে যাই, তাহলে মনে হবে ওগুলো বুঝি খেলনাগাড়ি, থেমে আছে। এইভাবে আরো ওপরে উঠতে-উঠতে যদি আমি একসময় মহাকাশে গিয়ে পৌঁছই, তাহলে এই খণ্ড-পূর্ণ পৃথিবীটাকে নিশ্চয়ই মনে হবে এক আশ্চর্য নিরুদ্বেগ গ্রাম, স্বপ্নময়—প্রতিযোগিতাহীন।

কিন্তু ধীরগতিতে নয়, খ্যাপা বুনো মোষের মতো, যেন মৃত্যু-পরোয়ানা হাতে নিয়ে গাড়িগুলি ভীষণভাবে অবিরাম প্রতিযোগিতার মধ্য দিয়ে ছুটে চলেছে। আর এরই মধ্য দিয়ে প্রাণ হাতে করে মানুষ প্রতিনিয়ত রাস্তা পার হচ্ছে। জানেই না কখন—আচ্ছা, হিরোসিমার মানুষেরা কিংবা আজ সকালে যে লোকটা মারা গেল, সে কি জানতে পেরেছিল, চেতনে কিংবা অবচেতনে, যে সে মারা যাবে? নিশ্চয়ই নয়। অথচ—

'আরে গেল, গেল—'

'নামবারটা নিন।'

'কার নামবার নেবেন মশাই, সে কি আর আছে, হাওয়া হয়ে গেছে। এখন এদিকে সরিয়ে আনুন ওনাকে।'

'শেষ হয়ে গেছে। স্পট ডেড।'

'এই অবস্থায় কেউ থাকে!'

'অফিস যাচ্ছিল—'

'দেখে তো তাই মনে হচ্ছে। এপাড়াতেই বোধহয়।'

'ব্যাগ খুললে হয়তো জানা যাবে।'

'কী দরকার। শেষে পুলিশের ঝামেলায় পড়ে যাবেন।'

'যাবার কথা অফিসে, অথচ—'

'যার গেল তার গেল—'

'জীবনের কিস্যু দাম নেই। মুখখানা দেখুন, থেঁতলে দিয়েছে একেবারে।'

'মিনিগুলো যা হয়েছে না, যেন বাপের জমিদারি পেয়ে বসেছে।'

একটি অজ্ঞাতপরিচয় মানুষের মৃতদেহকে কেন্দ্র করে অপরিচিত মানুষগুলির সংলাপ তার কানে স্পষ্ট ভেসে আসতেই সকালের সেই ভয়ংকর ঘটনাটি চোখের সামনে হুবহু ফুটে উঠল। লোকটা জানতেই পারল না যে সে মারা গেল, ঠিক যেমন হিরোসিমা-নাগাসাকির মানুষেরা টের পায় নি প্রশান্ত আকাশের স্তব্ধতা চিরে এগিয়ে-আসা সেই বিবেকহীন যান্ত্রিক শব্দের গতি এবং উদ্দেশ্য। তবে কি আণবিক আক্রমণে মৃত্যু আর মৃত্যুবীজ-ছড়িয়ে-দেওয়া যন্ত্রণাহীন হাহাকারের যে নির্লজ্জ ছবি দুটি গেঁথে আছে এই শতাব্দীর বুকে, তার সঙ্গে আজ সকালের ওই থ্যাঁতলানো মৃত্যুর কোনো মিল আছে? মৃত্যুর আগে কি ওই অসহায় মানুষেরা তাদের বিগত জীবনের কোনো ছবি দেখতে পেয়েছিল, যেমন দেখেছিলেন আমার বাবা? নাকি চাক্ষুষ মৃত্যু দেখতে-দেখতেই মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েছিল? সে আবার আকুল হয়ে ভাবল, কত মানুষ মারা গেছে হিরোসিমা-নাগাসাকিতে, কত? ভীষণ ব্যগ্র হয়ে উঠল হিমাংশু জানার জন্যে, যেন না জানা পর্যন্ত তার কোনো নিস্তার নেই। পাগলপ্রায় হয়ে চারপাশে তাকাল সে। সোমনাথকেই খুঁজল। কিন্তু কাছাকাছি ওকে দেখতে পেল না। ভিতরে আছে নিশ্চয়ই। এদিকে প্রশ্নটি তাকে প্রবলভাবে খোঁচাতে লাগল। আসলে একটি জলজ্যান্ত মৃত্যুর অভিজ্ঞতা নিয়ে সে ঐতিহাসিক নিষ্ঠুরতা স্পর্শ করতে চাইল।

'......আমরা জানি প্রথম বিশ্বযুদ্ধে মারা গেছে এক কোটি মানুষ, আর পঙ্গু হয়েছে দু কোটি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে মৃতের সংখ্যা গিয়ে দাঁড়ায় পাঁচ কোটি ৪০ লক্ষতে, আর পঙ্গু হয়েছে ন কোটি মানুষ... '

যেন ভীষণ ক্রোধে সবকিছু উলটে দিতে ভূমিকম্প হল, এমনভাবেই হিমাংশু চমকে উঠল। কখন যে সভা শুরু হয়ে গেছে সে টেরই পায় নি। হঠাৎ-ই কোনো বক্তার ওই কথাগুলি যেন তাকে চড় কষিয়ে তার দৃষ্টি আকর্ষণ করল। ওই পাঁচ কোটি ৪০ লক্ষের মধ্যে হিরোসিমা-নাগাসাকির কতজন আছে? —ভাবতে-ভাবতে সে হলঘরে প্রবেশ করল। সে টের পেল, তার পা দুটো ভীষণ ভারি হয়ে উঠেছে, যেন কোনো চক্রান্তকারী জগদ্দল পাথর তার পায়ের সঙ্গে বেঁধে দিয়ে তার চলনশক্তি রহিত করে দিতে চাইছে। হলঘরে ঢুকে হাতড়ানোর ভঙ্গিতে একটা চেয়ার ধরে সে পিছনের সারিতে বসে পড়ে। তারপর কান খাড়া করে একাগ্র হয়ে বক্তৃতা শুনতে লাগল।

'...হিরোসিমা দিবস আমরা পালন করছি সেইসময়ে, যখন, হিরোসিমা-নাগাসাকিতে যে বোমা ফেলা হয়েছিল, তার চেয়ে চার হাজার গুণ বেশি শক্তিশালী ৫০ থেকে ৬০ হাজারটি বোমা এই পৃথিবীতে মজুদ করে রাখা হয়েছে...'

শুনে হিমাংশু হতভম্ব হয়ে গেল। মৃত্যুর মতো স্তব্ধ বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকল সে বক্তার দিকে। তার মুখ বিবর্ণ, পায়ের নীচে এক অনন্ত শূন্যতা। সে ভীষণ বিপন্নবোধ করল।

'...আজকের পৃথিবীতে যত পারমাণবিক অস্ত্র জমা করা হয়েছে, তা দিয়ে একবার দুবার নয়, কমপক্ষে দু-শ বার এই পৃথিবীটাকেই জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে ছারখার করে দেওয়া যায়। পৃথিবীর সমস্ত মানুষকে শেষ করতে এখন মাত্র কয়েকটা মিনিটই যথেষ্ট...'

শুনতে-শুনতে হিমাংশু টের পেল, সে ক্রমশ দুর্বল, নিস্তেজ হয়ে পড়ছে। তার হাত, পা, শিরা, উপশিরা, স্নায়ু—সমস্ত-কিছুই শিথিল হয়ে পড়েছে দ্রুত, তার চিন্তাশক্তি লুপ্ত হয়ে যাচ্ছে, চোখের সামনেকার সবকিছু যেন ঝাপসা হতে শুরু করেছে।

...আপনারা শুনলে অবাক হবেন, আজকের পৃথিবীতে প্রতি মিনিটে অনাহারে যেখানে ১৫ জন করে মানুষ মারা যাচ্ছে, সেখানে প্রতি মিনিটে যুদ্ধখাতে ব্যয় করা হচ্ছে ১৫ লক্ষ ডলার। আপনারা শুনলে আরো অবাক হবেন—এই পৃথিবীর প্রত্যেকটি মানুষের জন্যে এখন মাথাপিছু বিস্ফোরকের পরিমাণ ১৫ টনেরও বেশি। দিনে-দিনে এই পরিমাণ আরো বাড়বে। অথচ...'

এরই পাশাপাশি বক্তাটি একে-একে অপর্যাপ্ত খাদ্যোৎপাদন, অপুষ্টি, দুর্ভিক্ষ, ইথিওপিয়া ইত্যাদি নিয়ে বলে যেতে লাগলেন। কিন্তু হিমাংশু স্পষ্ট করে আর কিছুই শুনতে পারল না। বহুদূরের খুবই হালকা শব্দ যেন তরঙ্গপ্রবাহে ভেসে তার কানের কাছে আসতে না

আসতেই মিলিয়ে যাচ্ছে। সবকিছু থেকে বিচ্ছিন্ন হতে-হতে সে যেন এক ভয়ংকর প্রস্তরীভূত অন্ধকারে তলিয়ে যাচ্ছে, তীব্র বিষক্রিয়ায় যেন মৃত্যুর কোলে দ্রুত ঢলে পড়ছে। তার মনে হল, সে বুঝি মারা যাচ্ছে। তার হৃদযন্ত্র বিকল হয়ে আসছে, রক্তচলাচলের গতি কমে আসছে, শরীরটা কেমন ঠাণ্ডা, কাঠ-কাঠ, সমস্ত তাপ-উত্তাপ নিঃশেষ হয়ে শেষবারের মতো তার চোখ বুজে আসছে আস্তে-আস্তে—সে মারা যাচ্ছে। মুহূর্তকালের জন্যে হিমাংশু তার স্ত্রীপুত্রের জন্যে বিচলিত হয়ে পড়ল, ভীষণ কষ্ট অনুভব করল, এবং একসময় দুহাত দিয়ে মুখ ঢেকে হু-হু করে কেঁদে ফেলতে চাইল। ওর বুকের ভেতরে এখন এক চরম হাহাকার। সেই হাহাকারের মধ্যে দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়েই সে ক্রমশ দূরে সরে যেতে লাগল, দূরে, বহুদূরে, এবং একটা সময়ে, সে জানে, এমন একটা স্তরে গিয়ে সে পৌঁছবে, যখন জীবনের কোনো শব্দ বা কোনো স্পন্দন তার কানে আর কোনোদিন পৌঁছবে না। কোনোদিনও না। এইভাবে নিকষ অন্ধকারের মধ্য দিয়ে মৃত্যুর পথে যেতে-যেতে সে দেখতে পেল, অন্ধকার ফুঁড়েই একটি ছবি, তারই ফেলে-আসা জীবনের একটুকরো মধুর ছবি তার চোখের সামনে উজ্জ্বল হয়ে ভেসে উঠেছে।···কোথা থেকে কেটে বাতাসে-ভেসে-আসা একটা রঙিন ঘুড়ির সুতো ধরে সে ছুটে চলেছে দিগন্তবিস্তৃত গাজরঙের মধ্য দিয়ে, ভীষণ জোরে ছুটে চলেছে সে, ভয়ের উন্মাদ আনন্দে তার ছুটন্ত শরীর থেকে খুশি ঝরে-ঝরে পড়ছে। হু-হু করে বাতাস ছুটে এসে তাকে জড়িয়ে ধরে যেন অভিনন্দন জানাচ্ছে, কারা যেন তার জয়ের সমর্থনে সারাটা আকাশ জুড়ে উড়িয়ে দিয়েছে নীল পতাকা। সেই অসীম নীলিমায় ডানা মেলে একঝাঁক দুরন্ত পাখি বড়ো ছন্দময় গতিতে উড়ে যাচ্ছে যেন তারই জয়ের খবরটি অন্য কোথাও পৌঁছে দিতে। মাথার ওপরে শূন্যে ফড়ফড়-করে-ওড়া ঘুড়িটি নিয়ে সে ছুটছে, ছুটছে, ছুটেই চলেছে প্রবল বেগে···একমনে বিভোর হয়ে বহুদূরের ছবিটি দেখতে-দেখতে সে আবিষ্কার করে ফেলে একসময়, কারা যেন তাকে একঝটকায় নতুন করে ওই ছবিটার ভেতরে নিক্ষেপ করেছে···সে ছুটছে, ছুটছে, ছুটেই চলেছে সে, কিন্তু তার মুঠোর মধ্যে এখন আর নেই শৈশবের ধরা সেই কাটা ঘুড়ির সুতো, বদলে তার নিজেরই প্রাণ চেপে ধরে সে ছুটছে, প্রাণপণ ছুটছে উদ্বেগে, ভয়ে, আর্ত-আশঙ্কায় দিগ্বিদিক-জ্ঞানশূন্য হয়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে। মাঝে-মাঝে ভয়ের চুঁটি চেপে ধরছে প্রবল জেদ, পরমুহূর্তেই আবার সমস্ত সত্তাকে ভয় গ্রাস করে ফেলছে। তবু হাতের মুঠোর মধ্যেকার ওই অমূল্য প্রাণ বাঁচাবার ভীষণ দায়ে, দায়িত্বে সে ছুটেই চলেছে। মাথার ওপরে বাতাস কেটে-কেটে সাঁতরে ভাসা শৈশবের ঘুড়িটি আর নেই, প্রচণ্ড শব্দে পৃথিবী কাঁপিয়ে ভয়ংকর এক বোমারু বিমান বাতাস আর শূন্যতা এফোঁড় ওফোঁড় করে প্রবল বেগে তাকে ধাওয়া করে চলেছে। বিমানটির ডুপাশে ছড়ানো অতিকায় দুটি ডানা সারাটা আকাশ ঢেকে এক ঘন, প্রস্তরীভূত অন্ধকারকে ঘাড় ধরে দ্রুত নামিয়ে আনছে পৃথিবীর বুকে। সেই অন্ধকারের মধ্য দিয়ে সে ছুটেই চলেছে। তার দম ফুরিয়ে আসছে, ঠোঁটের কোণে ফেনা জমে উঠছে, তবু দাঁতে দাঁত চেপে সে ছুটেই চলেছে, ছুটতে-ছুটতে সে প্রাণপণে খুঁজে নিতে চেষ্টা করে অন্য এক পৃথিবী। যেখানে সে এখান থেকে তার প্রাণ বাঁচিয়ে, নির্বিঘ্নে পৌঁছতে পারে।

কে সেই 'মনের মানুষ'?

রবীন্দ্রচেতনায় মানবধর্ম—তুষারকণা রায়। সমীর পুস্তকালয়। কলিকাতা-৯। পঁচিশ টাকা।

যে কবির রচনায় সতত অনুরণিত হয়েছিল মানবমনের যাবতীয় অনুভূতি, যাঁর অমল প্রকৃতিপ্রেম আর অপার্থিব আকুতি বারে-বারে ব্যক্ত হয়েছিল 'মানুষের সীমানায়', যিনি সারা জীবন ধরে নির্মম আঘাত-সংঘাতের মাঝেও মানুষের ওপর তাঁর প্রগাঢ় বিশ্বাস অটুট রাখতে পেরেছিলেন, সেই মহাকবি রবীন্দ্রনাথ যে প্রকৃতার্থে ছিলেন মানুষেরই কবি, এ বিষয়ে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই। স্বভাবতই তাই প্রশ্ন ওঠে যে, মানুষ ঠিক কোন্ রূপ ধরে দেখা দিয়েছিল কবির কল্পলোকে, অথবা অন্যভাবে বলা যায় যে, যে মানবধর্মে ছিল কবির আজীবন অঙ্গীকার, তার যথার্থ স্বরূপটি কী? মূলত এই প্রশ্নের সদুত্তরদানই আলোচ্য গ্রন্থের উদ্দেশ্য। লেখিকা শ্রীমতী তুষারকণা রায় তাঁর বিশ্লেষণের জন্য সংগত কারণেই প্রাথমিকভাবে নির্ভর করেছেন ১৯৩০ সনে অক্সফোর্ডে রবীন্দ্রনাথপ্রদত্ত 'দ্য রিলিজন অব ম্যান' শীর্ষক বক্তৃতামালার ওপর। একই সঙ্গে তিনি অন্যান্য সমস্ত প্রাসঙ্গিক তথ্যও অনুসন্ধান করেছেন। ফলত গ্রন্থটিতে লেখিকার নিষ্ঠা এবং শ্রমের চিহ্ন নিতান্তই স্পষ্ট। গ্রন্থটির আরও একটি গুণ এই যে, আধুনিক কালের অনেক তথাকথিত গবেষণাকর্মের মতো এটি তথ্য আর তত্ত্বের প্রাবল্যে এবং অতিকথনের উৎসাহে নীরস হয়ে ওঠে নি। অল্প কথায় সোজাসুজি লেখিকা তাঁর বক্তব্য পেশ করেছেন যদ্দ সাবলীল ভঙ্গিতে। সর্বোপরি লেখিকার আলোচনায় এমনই এক অনাড়ম্বর স্নিগ্ধতার পরিচয় পাওয়া যায় যা সহজেই পাঠকের মন আকর্ষণ করে।

লেখিকার মূল বক্তব্য এই যে, মানুষ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের প্রত্যয় দীর্ঘ বিবর্তনের মধ্য দিয়ে অবশেষে পরিণত পূর্ণ হয়ে ওঠে তাঁর জীবনের শেষ পর্বে। অর্থাৎ, তাঁর মতে, রবীন্দ্রচেতনায় মানবধর্ম-সম্পর্কিত ধারণার বিকাশ ঘটে এক দীর্ঘ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে। এই প্রক্রিয়াটিকে শনাক্ত করতে গিয়ে লেখিকা শুধুমাত্র কবির মনোভূমিতে বিচরণ করতে চান নি, তিনি কবির মননের ক্রম-

গ্রন্থসমালোচনা

বিকাশের ধারাটিকে সংযুক্ত করেছেন কবিজীবনের বিভিন্ন সময়ের বিষয়গত অবস্থা আর পরিপার্শ্বের সঙ্গে। এক কথায়, মনোগত এবং বিষয়গত পরিপ্রেক্ষিতের সমন্বয়ে তিনি বিশ্লেষণ করতে চেয়েছেন কবির মানবধর্মের বিবর্তন। এই পদ্ধতি অবলম্বন করে লেখিকা মানুষ সম্পর্কে কবির বিশ্বাসের কতকগুলি বিশেষ স্তর স্পষ্টভাবে চিহ্নিত করেছেন। তাঁর মতে সন্ধ্যা-সংগীতের কাল রবীন্দ্রজীবনের প্রথম পর্ব। এই পর্বে ব্যক্তিমানুষ হিসাবে কতকগুলি মৌল আত্মজিজ্ঞাসায় কবি উৎকণ্ঠিত, উদ্বিগ্ন এবং সংশয় আর অনিশ্চয়তায় আচ্ছন্ন। স্বভাবতই এই অধ্যায়ে রবীন্দ্রনাথের মানবতাবাদ আত্মমুখী এবং ব্যক্তিকেন্দ্রিক। দ্বিতীয় পর্বের সীমানা নির্ধারিত 'ছবি ও গান', 'কড়ি ও কোমল', 'মানসী' প্রভৃতি কাব্যের দ্বারা। এই পর্বে ভাতুজায়া কাদম্বরী দেবীর মধ্যে যথার্থ মনের মানুষের সন্ধান পেয়ে এবং এই পরম দোসরের অকৃত্রিম অনুরাগে সিঞ্চিত হয়ে কবি নিজের মধ্যে আবিষ্কার করেন 'স্বতন্ত্র, অপূর্ব, অসাধারণ আমি'-কে। লেখিকার ভাষায়, "এখানে তাঁর মানবতাবাদ একক ব্যক্তিসত্তার আত্মকেন্দ্রিক সাধনার পথ পার হয়ে এসে পৌঁছেছিল যুগ্মসত্তার আনন্দলীলার আত্ম-প্রকাশে। এখানে তাঁর মানবতাবাদের রূপ প্রকাশিত হয়েছে দ্বৈত সাধনায়।" তৃতীয় পর্ব চিহ্নিত 'সোনার তরী', 'চিত্রা' ও 'চৈতালি'র দ্বারা। কাদম্বরী দেবীর অনুরাগে ধন্য কবি যে যুগ্ম মানবসত্তাকে প্রত্যক্ষ করে একই সঙ্গে আদর্শ এবং কর্মযোগের দ্বারা উজ্জীবিত হয়েছিলেন, কাদম্বরী দেবীর অকাল-মৃত্যুতে যিনি তা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে নির্বাসিত হন এতদিনের আনন্দঘন অমর্তলোক থেকে। দয়িতার মধ্যে যে আনন্দদেবতাকে তিনি খুঁজে পেয়েছিলেন সেই দেবতা এবার তাঁর কাছে প্রতিভাত হয় জীবনদেবতা-রূপে। কবির উপলব্ধি ঘটে যে, "অন্তরের গভীরে সেই জীবনদেবতা এক এবং অনন্য রূপে সমস্ত জীবনের গতিপ্রকৃতি নিয়ন্ত্রণ করে চলেছে, অন্যদিকে জীবনের বিচিত্র লীলার মধ্যে তার প্রকাশ অভিব্যক্ত হয়ে চলেছে জীবনের স্তরে স্তরে।" জীবন-দেবতা সম্পর্কে এই উপলব্ধি কবিকে ব্যক্তিগত স্বার্থ এবং প্রবৃত্তির সংকীর্ণতা থেকে মুক্ত করে অর্থাৎ 'অহং'-এর

ক্ষুদ্রতার ঊর্ধ্বে নিয়ে গিয়ে বৃহত্তর মানবজীবনের সঙ্গে মিলিত হওয়ার আকাঙ্ক্ষাকে প্রবল করে তোলে। এরই ফলে, একদিকে গল্পগুচ্ছে বর্ণিত সাধারণ মানুষের বিচিত্র সুখ-দুঃখের আখ্যান, এবং অন্যদিকে বিরাট কর্ম-যজ্ঞে ব্যাপৃত হওয়ার জন্য তাঁর বিপুল কর্মিসত্তার উন্মেষ। লেখিকার মতে, এই ধারাটি চূড়ান্ত পরিণতি লাভ করে কবিজীবনের শেষ পর্বে যেখানে জীবনদেবতার প্রেরণায় কবি আশ্রয় গ্রহণ করেন এক আশ্চর্য উদারতার আঙিনায়, যেখানে জীবনদেবতা শেষ পর্যন্ত বিলীন হয়ে যায় বিশ্বমানবতায়। এই পর্বে কবি আবিষ্কার করেন চিরমানব বা চিরকালের মানুষকে "যে মানুষ লুকিয়ে আছে সকল মানুষের অন্তরের গভীরে, যে মানুষ সকল মানুষকে একসূত্রে বেঁধে রেখেছে, কবি যার নাম দিয়েছেন মহামানব।"

লেখিকাকে ধন্যবাদ যে, তিনি উল্লেখ করতে ভোলেন নি যে রবীন্দ্রনাথের মানবধর্ম প্রকৃতপক্ষে ছিল তাঁর কবিসত্তারই ক্রমাভিব্যক্তি, অর্থাৎ, দার্শনিক অথবা তত্ত্বজ্ঞানী হিসাবে নয়, নিছক কবি হিসাবেই তিনি অনুভব করেছিলেন মানুষের প্রতি টান যা কালক্রমে তাঁকে উত্তীর্ণ করে বিশ্ব-মানবতার উদার উন্মুক্তিতে। বস্তুত, এই সিদ্ধান্তে আশ্রয় নিলেই রবীন্দ্র-নাথের মানবতাবাদের নিরপেক্ষ বিচার সম্ভব। দুর্ভাগ্যক্রমে, লেখিকা রবীন্দ্র-নাথের মানবতাবাদের বিশ্লেষণে আগ্রহী, কিন্তু তার মূল্যায়নে নয়। কিন্তু এই মূল্যায়ন না করলে আলোচনা অসম্পূর্ণ থেকে যায়। রবীন্দ্রনাথের মানবপ্রেম ছিল সংশয়াতীত এবং বিক্ষিপ্তভাবে তিনি যে 'মাটির কাছাকাছি' এসে রক্ত-মাংসের মানুষের সুখদুঃখের ভাগ নিতে চেয়েছিলেন একথাও অস্বীকার করা যায় না। তথাপি সামগ্রিক বিচারে এ সিদ্ধান্তে আসা অন্যায় হবে না যে, রবীন্দ্রনাথ মানবতাবাদে আশ্রয় নিয়েছিলেন মূলত এক কবির ভূমিকায় যে কবি রোমান্টিকতা ও বিমূর্ত ভাবনার কুহেলী থেকে নিজেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত করতে পারেন নি। অর্থাৎ, বস্তুনিষ্ঠ সমাজচিন্তাবিদ হয়ে ওঠার ব্যাপারে রবীন্দ্রনাথের কাছে বিষম বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল তাঁর আত্মসচেতন কবিসত্তা। এর ফলে বাস্তবজগতে বিচরণশীল মানুষের চেয়ে তিনি বেশি আগ্রহী ছিলেন মানুষের বিমূর্ত ধারণায়। কাজেই রবীন্দ্রনাথ যখন ঘোষণা করেন: "জয় হোক মানুষের", তখন একে এক আদর্শায়িত মানবসত্তার জয়গান হিসাবেই মেনে নিতে হয়, যে মানবসত্তার সঙ্গে দৈনন্দিন জীবনের মানুষের দুস্তর ব্যবধান। এই কারণেই আধুনিক দৃষ্টিতে রবীন্দ্রনাথের মানবতাবাদের মূল্যায়ন করতে গেলে অনিবার্যভাবেই অসংখ্য প্রশ্ন ভিড় করে। লেখিকা এ বিষয়েদৃষ্টিপাত করলে তাঁর আলোচনা পূর্ণাঙ্গ হত।

অমলকুমার মুখোপাধ্যায়

সোহাগ-মাখা সকাল-সন্ধ্যাবেলা

সব হতে আপন—রানী চন্দ। বিশ্বভারতী, কলিকাতা। তিরিশ টাকা।

"অপার্থিব এক মায়া শান্তিনিকেতনের। এ মায়া ঘর বাঁধায়, আবার ঘর থেকে বাইরেও টেনে আনে। দূর-দিগন্ত কেবলই হাতছানি দেয়। এ কখনো পুরাতন হয় না।"

"এই একই গাছের সারি, একই দিগন্তের রেখা, একই উন্মুক্ত আকাশ। কিন্তু অবিরতই সে নতুন।"

"গুরুদেব বলতেন, এ হচ্ছে এই রাঙামাটির টান—ঘরছাড়ার টান। দেখিস না—এ দেশে কত বাউল। রাঙামাটির টানে সবাই বেরিয়ে পড়েছে।"

শ্রীমতী রানী চন্দের হাতে আবার একবার সেই লালমাটির দেশের আশ্চর্য ছবি তাঁর 'সব হতে আপন' গ্রন্থে। কত বার কত হাতে আঁকা হল, এই লেখিকার কলমেই আঁকা হয়েছে কত বার, অন্য প্রসঙ্গ লিখতে গিয়েও কোথা থেকে কখন ঢুকে পড়েছে শান্তিনিকেতনের ছবি, মুহূর্তে বিভোর করে দিয়েছে।

তবু, অপিচ, পুনশ্চ। পুনরাবৃত্তিরও অভাব নেই। কৌতূহলী মন বলে তাড়াতাড়ি এগোও, নতুন কী আছে দেখি। কিন্তু কী যে অমৃতবাদ মাথানো সেই ঘণ্টাধ্বনির আহ্বানে, ওঁ পিতা নোঽসি মন্ত্রে আশ্রমপিতাকে প্রণাম করায়, বৈতালিকের গানের অশ্রুত সুরে, পয়লা বৈশাখ-গান্ধী পুণ্যাহ-দোল উৎসবের বর্ণনায়, কিছুতে পুরোনো হয় না।

"ঝুর ঝুর করে শাল ফুল ঝরে পড়ছে তলায়। নিম মহানিম ফুলের ঝরনা বইছে হাওয়ায়। পাকা শিরিষ ফলগুলি ফট ফট করে ছিটকে পড়ছে মাটিতে। তারই মধ্যে রাঙা পথের লাল ধুলোয় পা রাঙিয়ে শিক্ষার্থী চলেছে আপন গম্য স্থানে। রবীন্দ্রনাথ আশ্রম গড়তে চেয়েছিলেন, যেখানে অধ্যাপকরা অবিরত জ্ঞানচর্চায় রত, সেখানে শিক্ষকের সঙ্গে অব্যবহিত যোগে যুক্ত ছাত্রের মন। কলাভবনে যার যার আসনে বসে ছবি আঁকছে ছেলেমেয়েরা, নন্দলাল ঘুরে-ঘুরে দেখেন, তাঁর হাতের ছোঁওয়ায় প্রাণ পাচ্ছে অপরিচিত কাঁচা হাতের কাজ। ছোটো-ছোটো কথায় চোখ ফুটিয়ে দেন নন্দলাল, কথাও কমই, হাতের রঙমাখানো তুলিটাই তাঁর হয়ে কথা কইত।

একবার, লেখিকা তখন গৃহিণী, রাধার বিরহের ছবি আঁকতে গিয়ে একটা গাছ নিয়ে বড়ো বিপদে পড়েছিলেন, গাছটাকে দূরে সরাতে চাই-ছিলেন, কিন্তু "যতই ফিনিশ করি গাছ এগিয়ে আসে।" আহ্বান পেয়ে নন্দলাল এলেন। ছবির সামনে বসলেন। খানিকক্ষণ চেয়ে রইলেন ছবির দিকে। "নন্দদা তুলিতে রঙ নিয়ে গাছের সঙ্গে যেন ভাব জমিয়ে ফেললেন। গাছ যেন নড়েচড়ে উঠল।" তিনি জানতেন কী করে ওদের ভোলাতে হয়, জাগিয়ে দিতে হয়।

যেখানে তুলির আগায়, কলমের মুখে, কণ্ঠের সুরে, পাথরের উপর ছেনি-বাটালির আঘাতে, মাটি কিংবা বাদ্যযন্ত্রের উপর অঙ্গুলিলীড়নে শিল্পীর আত্মপ্রকাশের যন্ত্রণা অবশেষে আনন্দের ফুল হয়ে ফোটে, সেখানে তিনি একান্ত একা। সেই শিল্পী-সত্তার নাগাল পায় না কেউ। সেখানে তাঁরা বাইরে ধরা দেন—আত্মীয় হয়ে, বন্ধু হয়ে, সহযাত্রী হয়ে, শিক্ষক হয়ে, সেই ছবিই ধরা থাকে। শ্রীমতী রানী চন্দ নিজে শিল্পী, শিক্ষক নন্দলালের উপদেশ-নির্দেশ লিপিবদ্ধ করছেন তিনি, জীবনের পথে চলতে সব মানুষের পক্ষেই তা মূল্যবান, তা সে শিল্পী হোক বা না হোক। বেড়াতে বেরিয়ে শিল্পীদের স্কেচ করাই রীতি, উৎসাহের আধিক্যে নতুন এই তরুণী শিল্পীকে গোছা-গোছা স্কেচ করতে দেখে এমনিই যেন গল্প মনে আসে নন্দলালের—তাঁদের গ্রামের একব্যাধ শেষ-উদ্যমে রোজ পাঁচটা মাটির গুলি পুড়িয়ে নিয়ে শিকারে বেরোত, তার একটাও বিফলে যেত না। শান্তি-নিকেতনের শিক্ষা কেবল মানুষকে মুক্তিই দেয় নি, সংযমও শিখিয়েছে। সে সংযম শুধু শিল্পেই নয়, জীবনেও অপরিহার্য।

শান্তিনিকেতন আশ্রম বলেই যাঁদের বোঝায়, যা বোঝায়, তার অনেকই এসেছে এই গ্রন্থের অবয়বের মধ্যে। আশ্রমিকরা, অতিথি অভ্যাগত, বন্ধুজন। সরোজিনী নাইডু থেকে বালা সরস্বতী, পণ্ডিত নেহরু, গান্ধীজী, উদয়শঙ্করের কথাকলি-গুরু শঙ্করন নাম্বুদ্রি, রাধাকৃষ্ণন্—কে নেই। বিদেশী এবং বিদেশিনীরাও আছেন—শান্তিনিকেতনের সম্পদের আসল ঘর-খানার চাবিকাঠির সন্ধান যাঁরা সকলেই পেয়েছেন নিজ নিজ স্বভাব অনুযায়ী।

রবীন্দ্রনাথ বরং একটু নেপথ্যে, রসের আসল জোগানদার যিনি। তবু নেপথ্যে থেকেও প্রধান হয়ে আছেন, তাঁকে আড়াল করবে কে। স্বীকার করতেই হবে 'গুরুদেব' বা 'আলাপ-চারী রবীন্দ্রনাথ'-এর মতো এ বইতে রবীন্দ্রনাথের ছবি ততটা বাস্তবিক নয়, অনেকটা আদর্শায়িত। তবে তাঁর সবচেয়ে জীবন-সংপৃক্ত যে ছবি এই বইতে আমাদের আকৃষ্ট করবে, তা যেন আরও অবিশ্বাস্য। বেজোয়াড়ার পথে রাজবাড়িতে যাওয়ার উপযুক্ত পোশাকে বনমালীকে সাজিয়ে নিজের মাথার টুপি তার মাথায় ধাবড়ে-থুবড়ে বসাবার চেষ্টা করছেন রবীন্দ্রনাথ—এ কথা বিশ্বাস করতে পারা যায়!

বমবে হায়দ্রাবাদ ওয়ালটেয়ারে কবির ভ্রমণসঙ্গিনী হয়ে যেসব বিচিত্র অভিজ্ঞতা হয়েছে, লেখিকা বিস্তারিত বর্ণনা দিয়েছেন তার। হাসিকৌতুক আড়ম্বর প্রাচুর্য ছাপিয়ে সেসব বর্ণনায় দক্ষিণ ভারতের সমাজ আর সংস্কৃতির কিছু-কিছু নিপুণ বিবরণ স্থান করে নিয়েছে। ধরা দিয়েছেন কোনো-কোনো মানুষ। শান্তিনিকেতন-বিশ্ব-ভারতীর কল্পনাকে রূপ দিতে যে রথযাত্রার আয়োজন করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ, কত মানুষ টান দিল সেই রথের রশিতে, প্রধানতম কয়েকটি নামই সবাই জানে তার, কত সহস্র মানুষের নাম হারিয়ে গেল—তারা কেবল ভিড়ের একজন, তারা নাম-গোত্রহীন। হায়দ্রাবাদের প্রধান-মন্ত্রী মহারাজ কিষণপ্রসাদের সচিব মেহেদীভাই-এর সঙ্গে যে লেখিকা আমাদের পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন, সেজন্য কৃতজ্ঞ আমরা। এমন আরও কারও-কারও পরিচয় পাওয়া যাবে, যাঁরা রবীন্দ্রনাথকে বুঝেছিলেন, তাঁর বিশ্বভারতীর জন্য সাহায্য আর সহানুভূতির হাত প্রসারিত করে-ছিলেন। মেহেদীভাই রবীন্দ্রনাথকে বিশ্রামের জন্য নিয়ে গিয়ে রেখে-ছিলেন বাঞ্ছারা হিলের একটি প্রাকৃতিকপরিবেশমণ্ডিত বাড়িতে। কোথায় আজ সেই বাড়ি রবীন্দ্রস্মৃতি-পূত? আর সেই পাহাড় কেটে-কেটে তৈরি করা মেহেদীভাইয়ের নিজের বাড়ি 'কোহিম্বান'? বাড়ি দেখে খুশি হয়ে রবীন্দ্রনাথ কবিতা লিখে দিলেন:

ঘন কাঠিন্য রচিয়া শিলাস্তূপে
দূর হতে দেখি আছ দুর্গম রূপে,
বন্ধুর পথ করিনু অতিক্রম
নিকটে আসিনু ঘুচিল মনের ভ্রম।
আকাশে হেথায় উদার আমন্ত্রণ
বাতাসে হেথায় সবার আলিঙ্গন।
অজানা প্রবাসে যেন চিরজানা বাণী
প্রকাশ করিল আত্মীয় গৃহখানি।

গৃহগাত্রে গৃহস্বামী উৎকীর্ণ করে দিয়েছিলেন এ কবিতা।

আমরা তো জোড়াসাঁকো ঠাকুর-বাড়িও যথাযথ মর্যাদায় রক্ষা না করে সেখানে বিদ্যার নামে অবিদ্যার বেশাতি সাজিয়েছি, শান্তিনিকেতনে বৃহদায়তন হস্টেলবাড়ি তুলেছি স্থান-সঙ্কুলানের বিকট জান্তব প্রয়োজনে—আমাদের নির্বিকার মনের নিরেট দেওয়ালে ধাক্কা খেয়ে ওসব মুড়ি-পাথর-ইঁটকাঠ কোথায় ছিটকে পড়ে। পরে গিয়ে কোনোসময় লেখিকা শহর বাঙ্গার হিলের বহু চোখধাঁধানো অট্টালিকার আড়ালে আত্মগোপন করে থাকা 'কোহিস্থান'কে শনাক্ত করেছিলেন। তার দেওয়ালগাত্রে উৎকীর্ণ সেই কবিতাটার কথা অনুক্ত রয়ে গেল।

স্মৃতিকথা ইতিহাস নয়। কিন্তু ইতিহাসের অনেক উপকরণ আর ইঙ্গিতকে সে কথাচ্ছলে ধরে রাখে। তেমনই দুটি ঘটনার কথা বলে এ বইয়ের আলোচনা শেষ করি।

মৃত্যুশয্যায় এনড্রুজকে রবীন্দ্রনাথ দেখতে যান নি, বরাবর এই কথাই প্রচারিত এবং সমালোচিত। যতই বলা হোক, ১৯৪০ সালের এপ্রিলে জরাপীড়িত কবির পক্ষে এ কর্তব্য করা সম্ভব ছিল না—সমালোচনা থামে না। কেননা বৃহৎ এবং মহতের দায়িত্ব-জ্ঞানহীন সমালোচনায় আমাদের দেশের মানুষের দক্ষতা অপরিসীম। এ বই থেকে জানা গেল, কলকাতায় প্রেসিডেন্সি জেনারেল হাসপাতালে রবীন্দ্রনাথ এনড্রুজকে দেখতে এসেছিলেন তাঁর মৃত্যুর কদিন আগে। সঙ্গে অনিল চন্দ ছিলেন। রবীন্দ্রনাথ পাশে গিয়ে দাঁড়াতে রোগক্লিষ্ট এনড্রুজ কথা বলতে চেষ্টা করলেন দু-একবার, পারলেন না। কবি নিঃশব্দ করলেন, কিছুক্ষণ এইভাবে থেকে চলে এলেন। সেই শেষ দেখা। অনিল চন্দ এ সম্পর্কে মিথ্যা সমালোচনার কথা জেনে অসুস্থ শরীরেও ২৭শে চৈত্র ১৩৮২ সনের 'দেশ' পত্রিকায় ঘটনাটি লেখেন। তার মাত্র এগারো দিন পরে তাঁর মৃত্যু হয়।

দ্বিতীয় ঘটনাটি আবুল গফ্‌ফর খানের জ্যেষ্ঠ পুত্র গণিখান আয়োজিত শান্তিনিকেতনের প্রথম স্ট্রাইক নিয়ে, শান্তিনিকেতনের ইতিহাসে তারও মূল্য সামান্য নয়। হাঙ্গেরীয় শিল্প-তত্ত্ববিদ মি ফাত্রি কলাভবনে ক্লাস নিতে এসে প্রতিদিনই মসমস শব্দে জুতো পরে ঢোকায় নন্দলাল-সহ সকলেই অসন্তুষ্ট আর ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন। যেখানে বিদেশীরাও বরাবর মেনেছেন এই অলিখিত নিয়ম, বলতেও হয় নি মুখে, সে জায়গায় বারবার অনুরোধ করেও ফাত্রিকে যখন শোনানো গেল না, গণিখানের নেতৃত্বে ফাত্রির ক্লাস বয়কট করে হাভেল হল থেকে সব ছাত্রছাত্রী বেরিয়ে এসে তাঁর কাজের প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন।

যার আকাশভরা কোলে হৃদয় দুলেছিল সেই শান্তিনিকেতনের স্মৃতি অনুক্ষণ দুলছে বুকের মধ্যে। আনন্দ-অশ্রুতে মিশে রামধনুর রঙে রাঙা সেই স্মৃতিকথা বলে-বলে ফুরোয় না, শেষ পাতাতে এসেও শেষ কথাটি খুঁজে পায় না মন। অনেক দিন আগে দেখা একটা দৃশ্য চোখের সামনে অলজল করতে থাকে—"শেষবেলার আলো ছড়িয়ে আছে পশ্চিম আকাশে। মৃন্ময়ীর বারান্দা হতে দেখছি—গুরুদেব দাঁড়িয়ে আছেন, অন্তরবির মুখোমুখি, পায়ের কাছে উন্মুক্ত দিগন্তের কালো রেখা। মনে হল যেন এক মহামানব দাঁড়িয়ে আছেন আশ্রমের ভূমিতে পা রেখে।"

প্রণতি মুখোপাধ্যায়

রবীন্দ্রনাথের স্বাদেশিকতার তত্ত্ব

রবীন্দ্রনাথ ও বিপ্লবী সমাজ—চিন্মোহন সেহানবীশ। বিশ্বভারতী, আচার্য জগদীশ বসু রোড, কলিকাতা-১৭। পৃষ্ঠা ২৩৫। পঁয়ত্রিশ টাকা।

বইখানা আমি প্রায় গোগ্রাসে গেলার মতো করে পড়ে ফেললাম। বইয়ের বিষয়বস্তু অতি স্পষ্ট। ভাষার বাহুল্য নেই, পুনরাবৃত্তি নেই। ঐতিহাসিক সততার সাক্ষ্য পদে-পদে। নির্দেশিকা যিনি করে দিয়েছেন, তাঁর কৃতিত্বও কম নয়।

বহু বেটেঘুটে, বহু দরকারি নথি-পত্র ঘেঁটে—যা আমাদের মতো পাঠকের কাছে কোনোকালেই প্রাপ্য হত না, চিন্মোহনবাবু বইখানা লিখেছেন। তা ছাড়া, অনেক বিপ্লবী বাঙলা ভাষায় যেসব বই আর আত্মকথা-জাতীয় পুস্তক লিখেছেন, তাও তিনি খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে পড়েছেন।

বইটির প্রধান বিচার্য বিষয় চারটি। ১। রবীন্দ্রনাথ কি কোনো বিপ্লবী দলের সদস্য ছিলেন? ২। রবীন্দ্রনাথের চোখে বিপ্লবী। ৩। বিপ্লবীদের চোখে রবীন্দ্রনাথ। ৪। বিপ্লবী জীবনের সন্ধিক্ষণে রবীন্দ্রনাথ। অবশ্য তৎকালীন জোড়াসাঁকোর পৃষ্ঠপট দিয়ে শুরু।

এ ভাগগুলি একটু লক্ষ করলেই পাঠক-পাঠিকারা পুস্তকের প্রতিপাদ্য সম্বন্ধে একটা ধারণা করতে পারবেন।

মহাত্মা গান্ধীর মতো অত বিতর্কিত ব্যক্তি নন রবীন্দ্রনাথ, বিপ্লবীদের চোখে। মহাত্মা গান্ধীর মতো রাজনীতিপ্রধান জীবনও নয় রবীন্দ্রনাথের। তিনি সর্বদাই বিপ্লবী বা স্বাধীনতার-জন্য-প্রত্যক্ষ-সংগ্রামীদের কাছে-কাছে ছিলেন না। ১৯১৬ সালে লেখা 'ঘরে বাইরে', ১৯২৬ সালে শরৎচন্দ্রের "পথের দাবী" সম্বন্ধে তাঁর বিরূপ মন্তব্য, এবং ১৯৩৪ সালে 'চার অধ্যায়ে'র ভূমিকা প্রচুর বিক্ষোভ সৃষ্টি করেছিল—বিক্ষোভ না বলে কতকটা অভিমান বলা যায়—রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে বিপ্লবীদের মনে, যে বিপ্লবীদের চিত্তের খোরাক আর মনের বল আবার তিনিই বরাবর তাঁর গানে আর কবিতায় জুগিয়ে গেছেন।

বিপ্লবীদের সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের দ্বৈত-ভাব ছিল। তিনি বিপ্লবীদের সাহসে, আত্মত্যাগে মুগ্ধ হতেন, কিন্তু তাঁদের কর্মকাণ্ডের স্পষ্ট বিরোধিতা করে গেছেন। কেবল বিরোধিতা নয়, তিনি বরাবর একটা পালটা কর্মপন্থা দেশবাসী এবং বিপ্লবীদের কাছে উপস্থিত করেছিলেন—যাকে বলা ক্রিয়েটিভ রেভোলিউশন। তিনি বলেছেন "সমগ্র দেশ ব'লে একটি জিনিস সমস্ত দেশের লোকেরই সৃষ্টি ...মুষ্টিমেয় আদর্শবাদী কয়েকজন তরুণের চূড়ান্ত আত্মদানের মারফত সারা দেশের মুক্তি অর্জন সম্ভব নয়। তার জন্য প্রয়োজন সারা দেশবাসীর জাগরণ। আর তার জন্য প্রয়োজন সুদীর্ঘ তপস্যার।" (পৃ ৪১)

কেবল রাজনীতি দিয়ে, 'যত দোষ নন্দ ঘোষ'—এই দোষারোপ একমাত্র ইংরেজের ঘাড়ে চাপিয়ে চমকপ্রদ বক্তৃতা দ্বারা সেই সামগ্রিক জাগরণ আনা সম্ভব নয়। এটাই ১৯০৫ থেকে ১৯০৭ সাল পর্যন্ত তিনি তৎকালীন কংগ্রেসকে বোঝাতে চেষ্টা করেন। কিন্তু তখনকার কংগ্রেসকে তা তিনি ধরাতে না পেরে, প্রত্যক্ষ রাজনীতি থেকে সরে যান। কিন্তু একদম সরে থাকতেও পারেন না, 'এবার ফিরাও মোরে' বলে তিনি তাঁর নিজস্ব চেষ্টা-চেতনার বাস্তবরূপ দিতে শ্রীনিকেতন স্থাপন করেন, এবং মুষ্টিমেয় সহকর্মীদের বলেন, তোমরা যদি একটি গ্রাম-কেন্দ্র স্বাবলম্বনের ভিত্তিতে খাড়া করতে পার, তবে তা দেশের কাছে একটা দৃষ্টান্ত হয়ে উঠতে পারে।

রবীন্দ্রনাথের মতো মহাত্মা গান্ধীও মনে করতেন যে স্বাধীনতা বা স্বরাজ কারো কাছ থেকে ছিনিয়ে নেবার বিষয় নয়। ইট হাজ টু বী বীল্‌ট ফ্রম উইদিন। তা করবার জন্য তিনি ১৮-দফা গঠনমূলক কর্মসূচী দিয়ে ভারতের সর্বত্র একটা স্বাবলম্বী কর্মকাণ্ড সৃষ্টি করার চেষ্টা করেন। যেমন রবীন্দ্রনাথও ২১-দফা কর্মসূচী উপস্থিত করেছিলেন। 'স্বদেশী সমাজ' ও 'পল্লী-প্রকৃতি' দ্রষ্টব্য।

কিন্তু এই সঙ্গে একথাও মনে রাখতে হবে যে, মহাত্মা গান্ধীর গঠনমূলক কর্ম দেশের স্বাধীনতার জন্য সত্যাগ্রহী সৈনিক ও সংগ্রাম সৃষ্টি করত, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের গঠনকর্ম ইংরেজদের সঙ্গে অথবা কায়েমি স্বার্থের সঙ্গে কোনো সংঘর্ষ সৃষ্টি করত না, যদিও ইংরেজকে একই সঙ্গে চোখরাঙানো আর অনুনয়-বিনয়ের রাজনীতিকে তিনি ঘৃণা করতেন।

রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, "আবার বলি, সারা দেশের প্রত্যেকটি নর-নারীর কানে সৃষ্টি-মুখর বিপ্লবের বাণী যদি না পৌঁছে দিতে পার, তবে তোমাদের দুর্বার চেষ্টায় **ইংরেজ পালালেও তোমরা বেঁচে থাকবে না। তার মানে তোমাদের আদর্শ বেঁচে থাকবে না।** অন্ধ জনতার পুরোভাগে এসে তারাই নেবে জয়ের পূর্ণ-ভাগ, যারা এতকাল অন্যায় ও অসত্যকে সমাজের প্রতি স্তরে লালন করে এসেছে।" (পৃ ১২৪)

কী দারুণ সত্য ভবিষ্যদ্বাণী! এখন আমরা বোধহয় হাড়ে-হাড়ে বুঝছি, স্বাধীনতার ৩৮ বছর পরেও দেশের চরিত্রে কী পচন, কী অনাচার, কী আত্মকলহ সৃষ্টি হয়েছে! শুধু তাই নয়, বিপ্লবী বা প্রাক্তন বিপ্লবীদের উপরেও নতুন জমানার ছেলেমেয়েদের বিন্দু-মাত্র শ্রদ্ধা নেই। (নিজে কখনও একদিন বিপ্লবী ছিলাম বা দেশের কাজ করেছি, এমন পরিচয় দিতে আমি বিশেষ কুণ্ঠিত বোধ করি।)

চিন্মোহনবাবু তাঁর এই বইয়ে বিপ্লবীদের এই উপেক্ষা আর অপমান থেকে রক্ষা করেছেন। সূর্যের আলোতে যেমন জগৎ বিভাসিত হয়ে ওঠে, তেমনি রবীন্দ্রনাথের চিন্তা-ভাবনা-গান-কবিতা-প্রবন্ধের আলোকে বিপ্লবীদের অপ-ক্রিয়মাণ চারিত্রিক দ্যুতিকে আবার

যেন আমাদের চোখের সামনে উপস্থিত করে দিয়েছেন চিন্মোহনবাবু। শ্রেয়েদের প্রতি শ্রদ্ধা ফিরে আসে এই বইখানিতে।

বলা বাহুল্য, বইখানি তৈরি হয়েছে রবীন্দ্রনাথের বিপ্লবী-সমাজ বা বিপ্লবীদের সম্বন্ধে ধারণা নিয়ে, **বিপ্লববাদ নিয়ে নয়।** যদিও মতাদর্শ বা ইডিয়লজি বাদ দেওয়া একদম সম্ভব নয়, বিপ্লবীদের রাজনৈতিক চিন্তাচেতনাকে অগ্রাহ্য করে কেবল বিপ্লবীদের আত্মত্যাগটাই সব নয়। ফলে মাঝে-মাঝে মতবাদিক বা তত্ত্বগত কথাও উঁকিঝুঁকি দিয়েছে। যেমন মানবেন্দ্রনাথের দীর্ঘ প্রবন্ধটির ("ফিলসফি অব প্রপার্টি") পুরোটা পরিশিষ্টতে দেওয়া হয়েছে। আমার মতে, ওটি না আনলেই ভালো হত। আমার মতো একজন সাধারণ লোকও আজ অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে ওই লেখাটাকে কুটিকুটি করে নস্যাৎ করে দিতে পারে। এ ব্যাপারে যদি মানবেন্দ্রনাথকেই আনতে হয়, তবে কেন রজনী পাম দত্তকে নয়, কেন মার্কসবাদীদের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের মিল বা অমিল নিয়ে কথা আসবে না? মানবেন্দ্রনাথ পণ্ডিত ব্যক্তি সন্দেহ নেই, কত বই যে লিখেছেন তার অন্ত নেই বোধ হয়, কিন্তু আমার মতে তাঁর সবটাই প্রায় পণ্ডশ্রম, এবং তাঁর পাণ্ডিত্য উনবিংশ শতাব্দীর ক্রুড বস্তুতন্ত্রবাদ (এমন কি ডায়লেকটিক্যাল মেটিরিয়লিজম পর্যন্ত নয়।) অতিক্রম করতে পারে নি। তাই বলে এই 'চিরবিদ্রোহী ব্রাহ্মণের' ব্যক্তিজীবনের অপরাজেয় পরিচয় (একালের ইউলিসিস) নিশ্চয়ই অবহেলার মতো জিনিস নয়।

আমি যতদূর জানি, চিন্মোহনবাবু মার্কসবাদী জগৎ থেকে এসেছেন, কিন্তু তিনি কট্টর বা গোঁড়া মার্কসবাদী নন, তাঁর দৃষ্টি আবদ্ধ নয়। তার জন্যই ভারতের বিপ্লবীদের কর্মকাণ্ড, দেশে এবং বিদেশে, এত কষ্ট আর ধৈর্য ধরে গবেষণা করেছেন এবং এখনও করে চলেছেন। কট্টর মার্কসবাদীদের কাছে তিনি রিভিশনিস্ট বলে পরিচিত কিনা জানি না।

নানা মতবাদের ছোটো-বড়ো আয়রন-জ্যাকেটের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ, গান্ধী, সুভাষচন্দ্র, রাসবিহারী, বাঘা যতীন এবং অন্যান্যদের পুরে ফেলে তাঁদের কঠোর বিচার করার এই চেষ্টা আজ সবদিক থেকে ব্যর্থ হতে চলেছে, অন্তত সত্যনিষ্ঠ গবেষকদের কাছে। ধীরে-ধীরে এই মতবাদিক অহঙ্কার কমে আসছে বলে মনে হয়। এটা ভালো লক্ষণ।

মতবাদ বা সমসাময়িক ধ্যানধারণা —যা নিয়ে একদা যাঁরা মরণপণ করে লড়েছেন—পোলিটিক্যাল স্ট্র্যাটেজি অ্যানড ট্যাকটিকসের ক্ষেত্রে যতই তাঁদের অর্বাচীন বা হাতুড়ে মনে হোক, তাঁদের স্বেচ্ছায় দুঃখবরণ এবং মৃত্যুপথ বেছে নেবার যে মানবিক আর নৈতিক মূল্য আছে, সেটাই দেশাত্মবোধ, সেটাই মানবিকতা। এই নৈতিক সম্পদ বাদ দিয়ে বিশ্বব্যাঙ্ক কেন, কুবেরের যাবতীয় অর্থ ঢেলেও দেশ গঠন করা যায় না, হাই টেকনোলজি আর ঠিকাদার দিয়ে দেশ গড়া যায় না, একথা বা এই সত্যটা স্মরণ করার জন্যও এজাতীয় বই আর প্রাক্তন বিপ্লবীদের লেখাপত্র আজকালকার ছেলেমেয়েদের পড়ানো উচিত। কিন্তু কেমন করে যে তা পারা যাবে, এই সার্বিক সিনিসিজমের যুগে, জানি না।

অত্যন্ত ভয়ে-ভয়ে, সংকোচ নিয়ে আর-একটা কথা উত্থাপন করতে চাই। চিন্মোহনবাবু বিপ্লবীদের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সম্পর্ক নিয়ে বেশ তথ্যনির্ভর লেখা লিখেছেন। কিন্তু গান্ধীর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের মিল আর অমিল নিয়ে কেন কিছু লিখলেন না? গান্ধী, রবীন্দ্রনাথ, বিপ্লবীরা আর কমিউনিজম —এ সবগুলি ধারাই ভারতে প্রায় একই সময়ে উপস্থিত হয় নি কি? এদের কোনো একটিকে বাদ দিয়ে কি অপরগুলিকে বোঝা সম্ভব? ১২১ সালে গান্ধীজীর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের 'চরকা', 'অসহযোগ'-নীতি নিয়ে যে বিরাট বিতর্ক হয়, সেটা না বিচার করলে বিপ্লবীদেরও পরিপূর্ণ বিচার সম্ভব নয়, রবীন্দ্রনাথেরও নয়। ১২৮ আর ১২৯ পৃষ্ঠায় ১৯৩০ সালে বিশিষ্ট কমিউনিস্ট নেতা সাজ্জাদ জহীর অকসফোর্ডে রবীন্দ্রনাথকে প্রশ্ন করেছিলেন, 'কবি, আজ আপনি এখানে কেন? আমাদের দেশ আজ মাতোয়ারা, গান্ধীজীর পাশেই কি আপনার স্থান নয়? আমাদের মন যে তাই চাইছে।" তার উত্তরে কবি বলেছিলেন: "তোমাদের আবেগ আমি বুঝি। তবে তোমরা বুঝবে কিনা জানি না, মহাত্মাজী বোঝেন, আমার অস্ত্র ভিন্ন। দেশ থেকে দেশান্তরে, ভারতবর্ষের চারণ হয়ে আমি ঘুরি, স্বাধীনতার লড়াইয়ে এটাই আমার কাজ।" সাজ্জাদ জহীর অবশ্য তাঁর ওই উদ্ধত প্রশ্নের জন্য পরে লজ্জা প্রকাশ করেছেন। কিন্তু ১৯২১ সাল থেকে ১৯৩০ সালের মধ্য দিয়ে অনেক জল বয়ে গেছে। এই দুই মহামানব, আমার মতে, অনেক কাছাকাছি এসে গিয়েছিলেন।

১৯০৮ সালে লেখা মহাত্মা গান্ধীর 'হিন্দ-স্বরাজ'-এর মতামত রবীন্দ্রনাথ গ্রহণ করতে পারেন নি। রবীন্দ্রনাথের মতে, আর অসহযোগ নয়, বিশ্বের সঙ্গে অবারিত সহযোগিতা চাই। হাজার বছরের অর্গলাবদ্ধ দুয়ার-জানালা তুলে দেবার প্রবক্তা ছিলেন রবীন্দ্রনাথ। কিন্তু পশ্চিমী সভ্যতার প্রতি মোহ যে তাঁর একদিন কেটে গিয়েছিল, সেটা 'সভ্যতার সংকটে' তাঁর শেষ রায়ে বিঘোষিত। একথা কি চিন্মোহনবাবুরা আজ অস্বীকার করতে পারেন? জাপানি ছাত্রদের কাছে পশ্চিমী-সভ্যতা সম্বন্ধে, ন্যাশনালিজম সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের বক্তব্যের সঙ্গে গান্ধীজির বক্তব্যে কি খুব বেশি পার্থক্য আছে?

মানবেন্দ্রনাথের বিরূপ মন্তব্য—রবীন্দ্রনাথের পল্লীপ্রকৃতি এবং তার সঠিক উন্নয়নের বিপক্ষে মতামত—যেন চিন্মোহনবাবু প্রকারান্তরে সমর্থন করেছেন, যখন তিনি উল্লেখ করেছেন, "নিজের মতকে ক্রমাগত অতিক্রম করার অপরিসীম ক্ষমতা" ছিল রবীন্দ্রনাথের। হ্যাঁ, তা নিশ্চয়ই ছিল, কিন্তু সেটা যন্ত্রদানবের আগ্রাসী নীতির বিরুদ্ধেই, পক্ষে নয়।

আমার অনুরোধ, চিন্মোহনবাবু এসব প্রসঙ্গে আরও আলোকপাত করবেন, কেননা তিনি এসব বিষয় নিয়ে অনেক পড়াশোনা, গবেষণা করেছেন।

সবশেষে আমি আবার বলতে চাই, বইখানা পড়ে, আমার বিশ্বাস আর শ্রদ্ধা দেশের প্রতি, দেশের বিপ্লবীদের প্রতি আরও দৃঢ় হল।

পান্নালাল দাশগুপ্ত

প্রণব মুখোপাধ্যায়

এপ্রিল ২৭—মে ত, ১৯৮৬-র 'ইলাস-ট্রেটেড উইকলি'-তে প্রকাশিত শ্রীপ্রণব মুখোপাধ্যায়ের একটি উক্তির প্রতি একটু মনোযোগ দিলেই স্পষ্ট বোঝা যায়, তাঁকে তৎক্ষণাৎ বিদায় দেওয়া ছাড়া কংগ্রেসের গত্যন্তর ছিল না। তরজমা করলে উক্তিটি এইরকম দাঁড়ায়:

অনেক বছর আমি সরকারে ছিলাম। অনেক বছর আমি অন্যতম কংগ্রেসি ছিলাম। শ্রীমতী গান্ধীর পূর্ণ আস্থা ছিল আমার ওপর। অনেকেই তার সাক্ষ্য দেবেন। কাজেই, অবশ্যই আমি অনেক কিছু জানি। কিছুকালের জন্যে আমাকে পাশে ঠেলে রাখা যায়। কিন্তু রাজনৈতিকভাবে আমাকে খতম করা যায় না। আমরা পরম শত্রুরাও তা জানেন।

'আমি অনেক কিছু জানি', কথাটা এইরকমভাবে বললেই তার পেছনে আরেকটা অনুক্ত কথার উপস্থিতি স্পষ্ট হয়ে ওঠে। সেটা হল, 'আমাকে খাঁচালে যা জানি তা ফাঁস করে দেব, সাবধান!' এই ধরনের ভীতিপ্রদর্শনকে ইংরেজিতে কী বলে, শ্রীপ্রণব মুখোপাধ্যায়ের তা না জানবার কথা নয়, এবং এও তিনি অবশ্যই জানেন, তাঁর এই কাজ আইনের চোখে দস্তুর মতো দুর্নীতি ফাঁস হবার ভয়ে প্রণববাবুকে ওরা তাড়াতে পারল না।

কাজেই, শ্রীপ্রণব মুখোপাধ্যায় কেন কংগ্রেস থেকে বহিষ্কৃত হলেন, সেটা কোনো প্রশ্ন নয়। প্রশ্ন হল: এমন কথা তিনি কেন বললেন? যে রাজনৈতিক দল দীর্ঘকাল শাসনক্ষমতা ভোগ করেছে, চোখের আড়ালে, (এবং সব সময়ে তত আড়ালেও নয়), তার নানা স্তরে নানা রকমের কালিমা জমে ওঠে, এ সকলেরই জানা। যিনি বাণিজ্যমন্ত্রী ছিলেন, অর্থমন্ত্রী ছিলেন, এবং, শোনা যায়, দলের জন্যে অর্থ-সংগ্রহের ব্যাপারেও যাঁর একটা বড়ো ধরনের ভূমিকা ছিল, তিনি সেসব

দেশে বিদেশে

আড়াল-দেওয়া, কিংবা আধো-আড়াল-দেওয়া ব্যাপারের কিছু-কিছু সন্ধান রাখবেন, তাতেও আশ্চর্য হবার নেই। তাঁর আগে ভারত সরকারে অর্থমন্ত্রিত্ব আরও অনেকে করেছেন, এবং থুইয়েছেন। দলের মধ্যে উচ্চ-পদে অন্যরাও অধিষ্ঠিত থেকেছেন, এবং সে পদ থেকে সরেও গেছেন, কিন্তু শ্রীপ্রণব মুখোপাধ্যায় দলের মধ্যে নিজের স্থান পাকা করবার জন্যে যে পন্থাটি বেছে নিলেন, তার নজির মেলা ভার। কিন্তু কেন? তিনি ভাবলেন কী করে এর পরেও তাঁকে দলে থাকতে দেওয়া শ্রীরাজীব গান্ধীর পক্ষে সম্ভব হবে? শ্রীমতী গান্ধী সম্পর্কে একটা কথা অনেককেই বলতে শোনা যায়, ভয় দেখিয়ে তাঁকে দিয়ে কিছু করাতে গেলে, কিংবা তাঁকে আটকাতে গেলে, উলটো ফল হত। শ্রীরাজীব গান্ধী সম্পর্কেও সে কথা খাটতে পারে, এ সম্ভাবনাটুকু অন্তত শ্রীপ্রণব মুখোপাধ্যায়ের মনে রাখা উচিত ছিল।

আসলে ২৭ এপ্রিল—৩ মে-র 'ইলাসট্রেটেড উইকলি'তে প্রকাশিত তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎকারের বিবরণ পড়ে মনে হয়, তিনি কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের সঙ্গে, এবং শেষ পর্যন্ত শ্রীরাজীব গান্ধীর সঙ্গে একটা সমুখসমরের জন্যে প্রস্তুত হচ্ছেন। যাকে বলে শো-ডাউন। কিন্তু সে প্রস্তুতির মানে এই নয় যে, যুদ্ধই তিনি চান। 'আমি যুদ্ধের জন্যে তৈরি, তোমার সাহস থাকে তো এগিয়ে এসো', একথা যে বলে, সে প্রায়শই আশা করে, প্রতি-পক্ষ ভয় পেয়ে পিছিয়ে যাবে। কিছুকাল আগে 'ব্রিঙ্কম্যানশিপ' বলে একটা কথা রুশ-মার্কিন সম্পর্কের ক্ষেত্রে খুব প্রচলিত ছিল। সেই ধরনের কিছু একটা শ্রীপ্রণব মুখোপাধ্যায়ের মনে ছিল বলে মনে হয়। এরকম পরিস্থিতিতে প্রতিপক্ষের মনোবলে চিড় ধরানোর চেষ্টা যদি সফল হয়, তাতে জয়লাভের সম্ভাবনা বেড়ে যায়। সম্ভবত সেইরকম কিছু একটা উদ্দেশ্য নিয়েই শ্রীপ্রণব মুখোপাধ্যায়, "অনেক কিছু জানি" বলেছিলেন। বাজি ধরেছিলেন, ঝুঁকি নিয়েছিলেন, বোধহয় ভেবেছিলেন, 'অল অর নাথিং'। এসপার-ওসপার যা হয় হোক। দান পড়ল, দেখা গেল, 'নাথিং'।

তার আগের সপ্তাহের 'ইলাসট্রেড উইকলি'তে শ্রীরাজীব গান্ধীর এবং তাঁর সরকারের সম্পর্কে এবং কংগ্রেসের এবং অন্যান্য দলের প্রধান-প্রধান রাজনৈতিক নেতাদের সম্পর্কে সর্ব-সাধারণের কী ধারণা, তাই নিয়ে একটা সমীক্ষার ফলাফল প্রকাশিত হয়। শ্রীরাজীব গান্ধীর পর কংগ্রেসের নেতা হবার সর্বোচ্চ যোগ্যতা কার আছে, এই প্রশ্নের উত্তরে দেশের বড়ো-বড়ো ছটি শহরের মধ্যে পাঁচটিতে, শ্রীপ্রণব-মুখোপাধ্যায়ের নাম অনেককে করতে দেখা যায়—(কলকাতায় তাঁর স্থান, অন্য সম্ভাব্য নেতাদের ওপরে; মাদ্রাজ ছাড়া অন্য সব শহরেই তিনি প্রথম চারজনের মধ্যে, যদিও বোমবাই এবং দিল্লীতে তিনি চতুর্থ)। এমনও হতে পারে এই সমীক্ষাই তাঁর মনে নিজের শক্তির সম্পর্কে একটা আস্থা এনে দিয়েছিল। শ্রীকমলাপতি ত্রিপাঠীর কাছ থেকেও তিনি প্রভূত আত্মবিশ্বাস আহরণ করে থাকবেন। কেননা, এমনিতে জন-সাধারণের ভোটে নির্বাচিত হওয়ার যাঁর অভ্যাস নেই, উচ্চ রাজনৈতিক পদ যাঁর কাছে আসে দলীয় নেতার প্রতি আনুগত্যের (এবং সম্ভবত যোগ্যতারও) পুরস্কারস্বরূপ, তাঁর পক্ষে হঠাৎ আত্মশক্তিতে এতখানি আস্থাবান হয়ে ওঠা একটু আশ্চর্য-জনকই বটে।

যাই হোক, প্রণববাবু অমন ত্বরিতগতি বহিষ্কার আশা করে না থাকলেও, 'ইলাসট্রেটেড উইকলি'তে প্রকাশিত তাঁর সাক্ষাৎকারে তিনি যেসব অভিমত ব্যক্ত করেছেন, সোজাসুজি কিংবা আভাসে ইঙ্গিতে, দলনেতা সম্পর্কে, দলীয় সরকারের

কাজকর্ম সম্পর্কে, এবং তাঁর নিজের ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা সম্পর্কে যেসব উক্তি করেছেন; তাতে শ্রীরাজীব গান্ধীর নেতৃত্বাধীন কংগ্রেসের সঙ্গে তাঁর নিজের রাজনৈতিক চলার পথ যে সম্পূর্ণ আলাদা হয়ে গেছে, সবটুকু তাঁর নিজেরও না বুঝবার কথা নয়। সে বিচ্ছেদ আনুষ্ঠানিকভাবে ঠিক কংগ্রেসি আইনকানুন অনুযায়ী ঘটানো হয়েছে কিনা, সে প্রশ্নের বিশেষ কোনো গুরুত্ব নেই।

'শো-কজ করা হয় নি,' 'কংগ্রেস সভাপতি সাসপেনড করতে পারেন, দলচ্যুত করতে পারেন না',—ইত্যাদি আপত্তি নিয়ে মাথা ঘামাবেন কংগ্রেসের ভেতরের লোকেরা, আর, দলীয় গণতন্ত্রের কথা প্রণববাবু যদি বলেন, যে পদ্ধতিতে তিনি ওপরে উঠেছিলেন সেটাও গণতান্ত্রিক ছিল না, কাজেই যে রাস্তা দিয়ে তাঁকে নেমে যেতে হল, সেটাও যদি গণতন্ত্র-সম্মত না হয়ে থাকে তা নিয়ে আপত্তি করা তাঁর সাজে কি?

লিবিয়া

শ্রীবলিরাম ভগত বলেছেন, করনেল গাডাফি বলেছেন কোনোরকম সন্ত্রাস-বাদী কার্যকলাপে তিনি লিপ্ত নন। বিদেশমন্ত্রী নিজে এ বিষয়ে কী বলেন, উক্ত বিবৃতি প্রদানের সময়ে লোক-সভায় তা জানিয়েছিলেন, এমন কোনো উল্লেখ খবরের কাগজে প্রকাশিত বিবরণীতে দেখতে পাই নি। (এই প্রসঙ্গে আমাদের বড়ো-বড়ো কাগজের সম্পর্কে একটা অনুযোগ জানিয়ে রাখি: অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়েও সংসদের কিংবা রাজ্যবিধান-সভার কার্যধারার যে বিবরণ তাঁদের হাত দিয়ে বেরোতে দেখা যায়, তা যেমন অসম্পূর্ণ তেমনি অবহেলাসূচক। এতে শুধু যে পাঠককে প্রয়োজনীয় তথ্য থেকে বঞ্চিত করা হয়, তাই নয়, সংসদীয় গণতন্ত্রের প্রতিও এর দ্বারা ঘোরতর অশ্রদ্ধা প্রকাশ পায়।) যত দূর মনে হয়, 'বুঝো লোক যে জান সন্ধান'-গোছের একটা ভাব নিয়ে তিনি কথাটা পাশ কাটিয়ে গেছেন। সেই সঙ্গে তিনি লিবীয় নেতার আরেকটি অভিমতের উল্লেখ করেছেন, যা থেকে স্পষ্টই বোঝা যায়, সন্ত্রাস-বাদের ব্যাপারটা বর্তমানে একটু ধোঁয়াটে হয়ে থাক, সেটা ভারতেরও অনভিপ্রেত নয়। শ্রীভগত বলেছেন, করনেল গাডাফির মতে ওই অঞ্চলে 'টেনশন'-এর প্রধান কারণ ফিলিস্তিনীদেরকে তাদের ন্যায়সঙ্গত অধিকার থেকে বঞ্চিত করে রাখা। সেইজন্যই তারা নিজেদের অভীষ্ট-সিদ্ধির উদ্দেশ্যে হিংসার পথে যেতে বাধ্য হয়েছে।

'সানডে অবজারভার' (এপ্রিল ২৭) পত্রিকায় শ্রীপ্রণয় গুপ্ত করনেল গাডাফির লিবিয়ায় বিশ্বব্যাপী উদ্যোগের একটা সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিয়েছেন। তার সঙ্গে ফিলিস্তিনী-দের 'ন্যায়সঙ্গত অধিকার'-এর সম্পর্ক খুঁজে বের করা খুব কঠিন। শ্রীগুপ্তে লিখেছেন: শ্রীলঙ্কায় তামিলদের জন্যে স্বতন্ত্র রাষ্ট্র আদায় করতে যে মার্কস-বাদীরা গেরিলাযুদ্ধে রত, মি গাডাফি তাদের অস্ত্র যোগাচ্ছেন, প্রশিক্ষণ দিচ্ছেন; পনজাব রাজ্যে শিখ বিচ্ছিন্নতাবাদীদের তিনি অর্থ ও অস্ত্র যুগিয়েছেন বলে জানা গেছে; মরক্কোর অধিকার-ভুক্ত পশ্চিম সাহারায় পলি-সারিও গেরিলাদের লড়াই চালিয়ে যেতে লিবিয়া সাহায্য করছে, লিবীয়

সৈন্যবাহিনী চাড আক্রমণ করেছে; সুদান, উগান্ডা, নাইজিরিয়া, ঘানা, মিশর, অলিজিরিয়া, টিউনিসিয়া, এবং পারস্য উপসাগরের অনেক রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে লিবিয়ার এজেন্টরা হস্তক্ষেপ করেছে; এল সালভাডোরে, এবং মধ্য ও দক্ষিণ আমেরিকার অন্যত্র বামপন্থী গেরিলাদের লিবিয়া অস্ত্রশস্ত্র সরবরাহ করেছে।"

কাজেই, ফিলিস্তিনীরা সুবিচার পেলে মধ্যপ্রাচ্যের যাবতীয় অস্থিরতা দূর হবে, একথা যদি বা ঠিক হয়, বিশ্বসন্ত্রাসবাদে লিবিয়ার উদগ্র উৎসাহও তৎক্ষণাৎ দপ করে নিবে যাবে, একথা করনেল গাডাফি বললেও শ্রীভগত বিশ্বাস করেন, তা আমাদের পক্ষে বিশ্বাস করা কঠিন।

ঠিক যেমন আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদী তৎপরতায় লিবিয়ার কোনো হাত নেই, শুধুমাত্র করনেল গাডাফির কথার ওপর নির্ভর করে ভারত তা সত্যি-সত্যিই মেনে নিয়েছে, এখন অন্তত সরল বিশ্বাসের পথ ধরে ভারতের বিদেশনীতি পরিচালিত হয়, আমরা কিছুতেই মানতে পারি না। আমাদের বিদেশমন্ত্রী নিজেও তা বিলক্ষণ জানেন, তাই করনেল গাডাফির জবানবন্দীটা লোকসভায় সদস্যদের সামনে পেশ করেই তিনি ক্ষান্ত থেকেছেন, খোলাখুলি বলেননি তিনি নিজে এ বিষয়ে কী মনে করেন।

আর, শুধু তিনি, কিংবা শুধু ভারত সরকারই বা কেন, নয়া দিল্লির বিজ্ঞানভবনে নির্জোট জাতিসমূহের সমন্বয়কারী সংস্থার বৈঠকে সমবেত প্রতিনিধিরা সবাই বিশ্বসন্ত্রাসবাদের সঙ্গে করনেল গাডাফির সংযোগের প্রমাণটি সযত্নে এড়িয়ে গেছেন, অন্তত সংবাদপত্রের বিবরণ থেকে তাই মনে হয়। শ্রীরাজীব গান্ধী সম্মেলনের উদ্বোধন করে যখন এই সংকটের মুহূর্তে লিবিয়ার প্রতি নির্জোট আন্দোলনে যারা তার সহযোগী তাদের সম্পূর্ণ সহানুভূতি আর সমর্থনের কথা ঘোষণা করেন, তখন পাঁচটি মহাদেশের মন্ত্রী এবং প্রতিনিধিদলের নেতারা উচ্চকণ্ঠে তাঁকে বাহবা জানান। কিন্তু সন্ত্রাসবাদের প্রশ্ন যখন ওঠে তখন লিবিয়ার ভূমিকার দিকে ইঙ্গিত যদি-বা করা হয়ে থাকে, তা এমন সুকৌশলে করা হয় যে কূটনৈতিক ভাষণের কায়দা-কানুন শেখাবার জন্যে কোন পাঠ্য-পুস্তক যদি কেউ রচনা করেন, আদর্শ দৃষ্টান্ত হিসাবে এই সম্মেলনে প্রদত্ত বক্তৃতাদি তিনি ব্যবহার করতে পারেন। সন্ত্রাসবাদের নিন্দা করা হয়, কিন্তু আসলে কে যে নিন্দিত হলেন, সে বিষয়ে যথেষ্ট সংশয়ের অবকাশও রেখে দেওয়া হয়।

বিদেশমন্ত্রী শ্রীবলিরাম ভগতের নেতৃত্বে যে প্রতিনিধিদল করনেল গাডাফির প্রতি নির্জোট আন্দোলনের সমর্থনের বার্তা বহন করে নিয়ে যান, তাঁরা কিন্তু ঘৃণাক্ষরেও সন্ত্রাসবাদের কথা তাঁর সামনে উথাপন করেছিলেন, সংবাদপত্রের বিবরণে এমন কোনো উল্লেখ নেই। শ্রীভগত লিবিয়ার ওপর আমেরিকার "বর্বরোচিত আক্রমণের" যে নিন্দা নির্জোট সম্মেলন করেছে, তা পুনরায় দৃঢ়ভাবে ব্যক্ত করেন। তিনি বলেন, সেই আক্রমণ "ভূমধ্যসাগর অঞ্চলে এবং সারা বিশ্বে শান্তি ও নিরাপত্তা বিপন্ন করেছে।"

ভূমধ্যসাগর অঞ্চলে শান্তি অবশ্যই বিঘ্নিত হয়েছে ত্রিপোলিতে এবং বেনগাজিতে মার্কিন বিমানের আক্রমণে, এবং সারা বিশ্বে উদ্বেগ এবং অনিশ্চয়তার একটা ভাব সৃষ্টি হয়েছে। তার একটা প্রধান কারণ, এখন আর কারো পক্ষেই আন্দাজ করা সম্ভব নয়, সন্ত্রাসবাদ দমনে মার্কিন প্রচেষ্টা ভবিষ্যতে কী আকার নেবে। যদি ভরসা রাখা যেত, প্রেসিডেন্ট রেগানের অবলম্বিত পন্থার বিরুদ্ধে আমেরিকার জনসাধারণের মধ্যে থেকেই একটা শক্তিশালী প্রতিরোধ আজ না হোক কাল গড়ে উঠবে, তা হলেও না হয় একটা কথা ছিল। কিন্তু এখন পর্যন্ত তার কোনো লক্ষণ তো দেখা যাচ্ছেই না, বরং এ পর্যন্ত জনমতসমীক্ষা যা কিছু হয়েছে তাতে বিমান আক্রমণের প্রতি মার্কিন জনসাধারণের বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠের সমর্থনই সূচিত হয়। 'নিউজউইক' সাপ্তাহিক যে, সমীক্ষা চালিয়েছিল তার ফলাফল হয়েছে: বিমান আক্রমনের সমর্থনে শতকরা ৭১ জন, বিরোধিতায় শতকরা ২১ জন। এই অবস্থায় প্রেসিডেন্ট সন্ত্রাসবাদের পিছু ধাওয়া করে আরও কতদূর এগিয়ে যাবেন, কে জানে?

সন্ত্রাসবাদী উদ্যোগে লিবিয়া ক্ষান্ত না হলে আবার সে দেশে বিমানহানার সম্ভাবনার কথা তো প্রেসিডেন্ট রেগান বলেছেনই, তার ওপরে আরও একটা পদক্ষেপ নিয়েছেন যার সম্ভাব্য পরিণতির কথা চিন্তা করাই কঠিন।

গত ১৭ এপ্রিল মার্কিন কংগ্রেসে একটি বিল উথাপিত হয়েছে। সেই সেই বিল আইনে পরিণত হলে, বিদেশী সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ দমনের জন্যে উপযুক্ত ব্যবস্থা কংগ্রেসের সঙ্গে পরামর্শ না করেই, অর্থাৎ কংগ্রেসকে পূর্বাহ্নে না জানিয়েই প্রেসিডেন্ট নিতে পারবেন। এমন কি বিশেষ-বিশেষ অবস্থায় কোনো বিদেশী রাষ্ট্র-প্রধানের প্রাণনাশের আদেশও তিনি দিতে পারবেন। বর্তমান আইনে তাঁর সে ক্ষমতা নেই। ১৯৭৩ সালে প্রেসিডেন্ট নিকসনের ভিটো অগ্রাহ্য করে মার্কিন কংগ্রেস একটি আইন পাশ করে, 'ওয়ার পাওয়ারস আক্ট'। সেই আইনে যুদ্ধে মার্কিন সৈন্যবাহিনী নিয়োগের আগে প্রেসিডেন্ট কংগ্রেসের পরামর্শ নিতে বাধ্য। নতুন আইন, যদি পাশ হয়, ওয়ার পাওয়ারস আক্টকে আরোপিত বাধা থেকে প্রেসিডেন্টকে অব্যাহতি দেবে, যদি তিনি সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ, অথবা তার আশঙ্কার প্রতিরোধে 'সাংঘাতিক শক্তি' (ডেডলি ফোরস) প্রয়োগের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।

অবশ্য এ আইন শেষ পর্যন্ত পাশ হবে কিনা সন্দেহ, কেন না ভিয়েতনামের স্মৃতি আমেরিকায় এখনও পীড়াদায়ক। তবু, একথা মনে রাখা ভারতের পক্ষে, এবং তৃতীয় বিশ্বের পক্ষেও বুদ্ধিমানের কাজ হবে যে অধিকতর-সংখ্যক আমেরিকাবাসীর চোখে করনেল গাডাফি অপরাধী, বিশ্বসন্ত্রাসবাদের তিনিই অবিসংবাদিত নেতা। প্রমাণ? নিশ্চিন্ন, আদালত-গ্রাহ্য প্রমাণ আছে কিনা বর্তমান পরিস্থিতিতে সেটা বড়ো কথা নয়। অভিযুক্তকে দোষী সাব্যস্ত করার যথেষ্ট কারণ আছে বলে আমেরিকা মনে করে, এবং প্রায় গোটা পশ্চিমী দুনিয়া এ বিষয়ে আমেরিকার সঙ্গে একমত, এটাই বড়ো কথা। (এমন কি মধ্যপ্রাচ্যে আরব দুনিয়াতেও করনেল গাডাফির জনপ্রিয়তা রঙ্গমঞ্চে মার্কিন বিমানের আবির্ভাবের আগে পর্যন্ত ঈর্ষণীয় ছিল না, এবং তার পরেও বিভিন্ন আরব দেশ তাঁকে কতটা ভালোবাসতে আরম্ভ করেছে, সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ যথেষ্ট।) লক্ষ করবার বিষয়, যে ফরাসি দেশ লিবিয়ার হানা দেবার জন্যে মার্কিন বিমানকে নিজের আকাশপথ ছেড়ে দিতে অস্বীকার করে। সেখানেও জনমতসমীক্ষায় প্রকাশ পেয়েছে, প্রেসিডেন্ট রেগানের গৃহীত ব্যবস্থার সমর্থক শতকরা ৬১ জন এবং তার বিপক্ষে শতকরা ৩২ জন (নিউজউইক সমীক্ষা)। এবং আরও লক্ষণীয়, নানা পশ্চিমী দেশে যাঁরা লিবিয়ার বোমা বর্ষণের নিন্দা করেছেন, তাঁদের মধ্যেও, নির্জোট সম্মেলনের মতো, গাডাফিকে অকুণ্ঠ সমর্থন জানাবার মতো লোকের সংখ্যা প্রায় আঙুলে গোনা যায়। ব্রিটেনের পারলামেনটে এ বিষয়ে, অর্থাৎ ব্রিটেনে অবস্থিত মার্কিন বিমানকে লিবিয়া আক্রমণে ব্যবহৃত হতে দিয়ে মিসেস থ্যাচার ঠিক করেছেন না ভুল করেছেন, তা নিয়ে, যে বিতর্ক হয়েছিল তাতে করনেল গাডাফির সম্পর্কে বিরোধিপক্ষকে দেখা যায় সরকার পক্ষের সঙ্গে প্রায় সম্পূর্ণ একমত। দ্বিমত যেটুকু দেখা দেয় তা বিমানহানায়, এবং তাতে ব্রিটেনের সহযোগিতার যৌক্তিকতা নিয়ে। সর্বপ্রধান প্রশ্ন ছিল, যে উদ্দেশ্য নিয়ে বিমানগুলি ত্রিপোলি এবং বেনগাজিতে পাঠানো হয়, সে উদ্দেশ্য কি তার দ্বারা সিদ্ধ হবে না, বরং উলটো উৎপত্তিই ঘটবে, অর্থাৎ বিতর্ক উদ্দেশ্য নিয়ে নয়, পন্থা নিয়ে। করনেল গাডাফিকে নিয়ে নয়, তাঁকে ঠাণ্ডা করবার শ্রেষ্ঠ উপায়টি কী তাই নিয়ে।

লিবিয়া এবং তার নেতা সম্পর্কে পশ্চিমী দেশগুলির ঐক্যমত মার্কিন বিমানহানার পর বরং আয়ত্ত প্রকট হয়ে উঠেছে। ব্রিটেন ২১ জন লিবীয়কে বহিষ্কার করেছে, পশ্চিম জারমানি লিবীয় 'পীপলস্ বুরো' অর্থাৎ দূতাবাসকে আদেশ দিয়েছে, সেখানে কর্মরত ব্যক্তিদের সংখ্যা ৪১ থেকে কমিয়ে ১৫-তে আনতে, বেলজিয়াম, হল্যানড সেই একই ব্যবস্থা নিয়েছে, ফ্রান্স ৬ জন লিবীয়কে বহিষ্কার করেছে। তারপর, ৫ই এপ্রিল ছটি প্রধান পাশ্চাত্য শিল্পোন্নত দেশের নেতারা টোকিও শহরে এক শীর্ষ-সম্মেলনে মিলিত হয়ে ঘোষণা করেছেন, লিবিয়ার বিরুদ্ধে তাঁরা কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। তার মধ্যে আছে, সেদেশে অস্ত্রশস্ত্র সরবরাহের নিষেধ, অন্যত্র তার দূতাবাসগুলিতে কর্মরত ব্যক্তির সংখ্যা কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ, ইত্যাদি। তবে লিবিয়ার বিরুদ্ধে অর্থনৈতিক ব্যবস্থা গ্রহণের ব্যাপারে খুব একটা অগ্রসর হতে কাউকে আগ্রহী বলে এখন পর্যন্ত মনে হচ্ছে না। তার কারণ সেরকম কঠোর অর্থনৈতিক ব্যবস্থা নিয়ে লিবিয়াকে কাবু করা অবশ্য সম্ভব হতে পারে, কিন্তু তাতে 'দণ্ডিতের সাথে' দণ্ডদাতাকেও কিছু দণ্ড দিতে হয়। ব্যবসাবাণিজ্য ইত্যাদিতে উভয়পক্ষেরই লাভ, তা বন্ধ হলে উভয়পক্ষেরই লোকসান। লিবিয়ার সঙ্গে আমেরিকা সে-জাতীয় সম্পর্ক ছিন্ন করেছে, আর্থিক ক্ষতি সত্ত্বেও। অন্য সব দেশ সে ক্ষতি মেনে নিতে যদি ততটা আগ্রহী না হয়ে থাকে, তা নিয়ে রাগারাগি করা বৃথা।

আমেরিকা চেয়েছিল কার্যকর অর্থনৈতিক ব্যবস্থা লিবিয়ার বিরুদ্ধে গৃহীত হোক। তার সে ইচ্ছা অপূর্ণ থেকে গেছে। লিবিয়ায় বিমানহানার পর কিন্তু অনেক বন্ধু-রাষ্ট্র এই বলে তার সমালোচনা করেছে যে, সামরিক অভিযান না চালিয়ে বরং অন্য উপায়ে করনেল গাডাফিকে শায়েস্তা করা যেত, যথা অর্থনৈতিক সম্পর্কচ্ছেদ। কিন্তু আগে বিশেষ কেউ এগিয়ে আসে নি সে কাজ করতে, এখন এগোয় কিনা দেখা যাক।

যাই হোক, করনেল গাডাফি চার্লস শোভরাজের চেয়ে অনেক বেশি বিপজ্জনক আন্তর্জাতিক অপরাধী, বহু নিরীহ নিরপরাধ ব্যক্তির, শিশুর নারীর রক্তে তিনি হাত রাঙিয়েছেন, এবং সেই রক্তাক্ত হাত সগর্বে তুলে ধরেছেন বিশ্ববাসীর চোখের সামনে, এ বিষয়ে সত্যি-সত্যিই দ্বিমত পোষণ করেন, তেমন লোকের সংখ্যা, পশ্চিমী দেশে তো বটেই, তার বাইরেও কম।

সে তুলনায় লিবিয়ায় মারকিন বোমাবর্ষণের বিরুদ্ধে আপত্তি জানিয়েছেন পশ্চিমী দুনিয়ারও অনেক-বেশি-সংখ্যক লোক মারকিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে মৈত্রীবন্ধনে আবদ্ধ একাধিক দেশও সে বিষয়ে ঘোরতর অসন্তোষ প্রকাশ করেছে। তাদের মতে, এই আক্রমণ শুধু অপরিণামদর্শী, হিতাহিতবিবেচনা বর্জিত নয়, আন্তর্জাতিক আইন এবং রাষ্ট্রপুঞ্জের সনদ অনুযায়ী নিন্দনীয়।

রাষ্ট্রপুঞ্জের সনদের ধারা ২-এর অনুচ্ছেদ (৪) স্পষ্ট ভাষায় বলেছে, সমস্ত সদস্য-রাষ্ট্র তাদের আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে কোনো রাষ্ট্রের ভৌগোলিক অখণ্ডতার বিরুদ্ধে, রাজনৈতিক স্বাধীনতার বিরুদ্ধে, এবং রাষ্ট্রপুঞ্জের উদ্দেশ্যের সঙ্গে সংগতিপূর্ণ নয়, এমন কোনো ভাবে, শক্তিপ্রয়োগের ভয় দেখানো থেকে, এবং শক্তিপ্রয়োগ থেকে বিরত থাকবে।

সনদের ধারা ৫১-তে সশস্ত্র আক্রমণের বিরুদ্ধে আত্মরক্ষার অধিকার স্বীকৃত হয়েছে, কিন্তু মারকিন যুক্তরাষ্ট্র লিবিয়ার সম্পর্কে সে দাবি করতে পারে বলে মনে করা কঠিন। কাজেই, বিশ্বজনমতের এক বৃহৎ অংশ লিবিয়ায় মারকিন বিমানহানার যদি নিন্দা করে থাকে, অন্যায় কিছু করে নি। তা ছাড়া, আমেরিকা যতই মনে করে থাক বিশ্বসন্ত্রাসবাদবিরোধী বিশ্বব্যাপী সংগ্রামের নেতৃত্ব তারই ওপর বর্তেছে, নিজের প্রয়োজনে সে যখন সন্ত্রাসবাদের প্রতি সহনশীলতা প্রদর্শনে পরাঙ্মুখ নয়, তখন তার সে স্ব-আরোপিত নেতৃত্ব সর্বজনের স্বীকৃতি যদি না পায়, তাতে অবাক হবার কিছু নেই। এই অবস্থায় বরং আমেরিকা যদি সন্ত্রাসবাদবিরোধী অভিযানে নিজের প্রাধান্যটাকে বিশ্বজনের চোখে অমন নাটকীয়ভাবে প্রকট করে না তুলত, তা হলেই বোধহয় ভালো হত।

তা হলে হয়তো ভারতের পক্ষে, এবং নির্জোট আন্দোলনের পক্ষেও উপলব্ধি করা এবং স্বীকার করা, সহজ হত, করনেল গাডাফিকে অমন করে বুকে টেনে নেওয়ার কোনো কারণ নেই। ৭. ৫. ৮৬

ভবানীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

সিনেমা

লড়াই কোনির একলার নয়

সম্প্রতি কাগজে খেলাধুলোর পৃষ্ঠায় একই সঙ্গে এই হেডলাইন দুটি মনোযোগ কেড়েছিল : গোষ্ঠীদ্বন্দ্বে ক্ষতবিক্ষত সর্বভারতীয় ক্রীড়াসংস্থা এবং জেটোপেক মাত্র বাঁচার জন্য একসময় জঙ্গল পরিষ্কার করতেন। যথাক্রমে স্বদেশী ক্ষতির দিক আর বিদেশী 'অর্জনে'র দৃষ্টান্ত। এদেশে কি তবে কেবল সমূহক্ষতিকারক গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব-সংঘর্ষই আছে, লাভজনক ব্যক্তিগত লড়াই-সংগ্রাম নেই? তা নয়। তবু স্বদেশী নানা বাস্তব ঘটনার প্রত্যক্ষ-পরোক্ষ পরিচয়ে তৎক্ষণাৎ মনে হয়েছিল : এদেশে গোষ্ঠীবিরোধ আর দলাদলি তথা ব্যক্তিগত পদপ্রতিপত্তি আর ক্ষমতালাভের আত্মঘাতী খেয়োখেয়ি আমাদের যত সর্বনাশ করছে, ব্যক্তিগত শ্রেণীগত লড়াই ততই চাপা পড়ছে তার ধ্বংসাবশেষের তলায়। তারই একটি চমৎকার সত্যনিষ্ঠ চলচ্চিত্র-নিদর্শন আজকের আলোচ্য 'কোনি'কে আরও যেন প্রাসঙ্গিক এবং তাৎপর্যমণ্ডিত করে তুলছে।

কাহিনীচিত্রটি আদ্যন্ত প্রবাহিত হয়েছে যুগপৎ দ্বিস্তর জীবনোন্মোচনে: সাঁতার-প্রশিক্ষক ক্ষিতীশ এবং উদীয়মান সাঁতারু কোনির উভয়ত-ব্যাপ্ত গভীর জীবনযন্ত্রণাকে ঘিরে। লড়াই কোনির একলার নয়। জীবন আর জীবিকার ক্রমশ-কঠোর সংগ্রামে কোনির একদিকে যেমন ভয়ংকর দারিদ্র্য আর ক্ষুধা, তেমনি ধাপের পর ধাপ হিয়া-অমিয়া-রমাযোশীদের সঙ্গে তার কঠিন প্রতিযোগিতা—পূর্বাহ্নের কঠিন-কর্কশ প্রশিক্ষক 'ক্ষিদ্দার' শিক্ষা-শৃঙ্খলা-নিয়ম-শ্রম-দম আর শাসন, সঙ্গে নানা বহিরাগত বৈরিতা, বাধা, অপমান, লাঞ্ছনা আর পীড়ন—যা তারআর 'ক্ষিদ্দা' দুজনেরই যৌথ যন্ত্রণা। অন্যস্তরে জুপিটার ক্লাব থেকে অন্যায়ভাবে সদ্য-বিতাড়িত ক্ষিতীশের আদর্শ-আকাঙ্ক্ষাগত তীব্র লড়াই—কেবল হরিচরণ-ধীরেন ঘোষ-প্রফুল্ল ও এম এল এ-সভাপতি বিনোদ ভড়ের সঙ্গে নয়—তার সংগ্রাম আপাত-অকর্মণ্যতার খোলস ভেঙে কোনির সার্থক প্রশিক্ষণের স্বার্থে, তার আর তাদের পারিবারিকভাবে বেঁচে থাকা-বাঁচিয়ে রাখার প্রয়োজনে স্বতন্ত্র অর্থোপার্জনের নানা বুদ্ধি-কৌশলজড়িত প্রচেষ্টায় বিস্তারিত; স্বয়ং তারই কথায় তার চেয়ে 'কাজের বেলায় দশগুণ লম্বা' স্ত্রী লীলাবতীর সঙ্গে তার সময়োচিত সহযোগিতা আর সমঝোতায় পর্যন্ত তা ছড়ানো-জড়ানো; অনুষঙ্গে জুপিটার বনাম অ্যাপোলো, বিনোদ ভড় বনাম বিষ্টুধর প্রতিযোগিতা-ক্ষেত্রের সম্প্রসারিত কূটবুদ্ধির খেলায়, 'ম্যানিপুলেশনে' এবং সর্বোপরি কোনিকে শারীরিক-মানসিক-মনস্তাত্ত্বিক গড়নে-গঠনে সুষ্ঠু ও সার্থক করে তোলার সর্বতোমুখী চ্যালেনজের মোকাবিলায়, আয়োজনে নিহিত। তাদের দুজনেরই যুদ্ধ এবং দ্বন্দ্ব স্থলেজলে সর্বত্র। এজন্য ক্ষিতীশের একাগ্র ব্যাকুল প্রয়াস বারবার অশিক্ষিত-শিক্ষার্থী কোনিকে, তার জেদ, রোখ, আত্মসম্মান আর ক্ষুধা-নিবৃত্তির প্রয়োজন-প্রযোজনাকে উদ্দীপিত করার—কখনো প্রলোভনে, কখনো প্ররোচনায়, কখনো প্রতিযোগীর প্রতি বিদ্বেষ আর ঘৃণার উত্তেজনায়। সবটাই তাকে সাধতে হয় নিপুণ বিচক্ষণতায় আর কঠিন আত্মত্যাগে, দুঃখবহনে। কোনির প্রত্যুয়মান সাফল্যে যে তারই গভীর সত্তা এবং অস্তিত্বের একাংশের সার্থকতা। সে তাই কোনিকে বলে : শক্তিপরীক্ষা তার একার নয়, তাদের দুজনেরই।

এজন্যই দ্বিস্তর-বহুস্তর প্রতিদ্বন্দ্বিতা আর লড়াই-এর ক্ষেত্র বিস্তৃত থেকে বিস্তৃততর হয়েছে গোটা কাহিনীচিত্রে এবং যথাযথ প্রতিফলিত হয়ে উঠেছে জীবনের সংগ্রাম এবং সংগ্রামের জীবন—যেখানে কোনি একা নয়, অনেকেই স্ব স্ব ক্ষেত্রে ও ভাবে সন্নিবেশিত। যেখানে একে অপরকে ছাড়া দাঁড়াতে পারে না, বাড়তে পারে না, বাঁচতে পারে না। ক্ষিতীশের যেমন দরকার হয় ভেলো আর স্ত্রী লীলাবতীর সাহচর্য ও সহযোগিতা—লীলারও প্রয়োজন পড়ে তার 'প্রজাপতি' দোকান বাড়ানোয় সেই ক্ষিতীশেরই সক্রিয় অংশগ্রহণ তথা বিষ্টুধরের উপযোগিতা, উভয়ত। বিষ্টুধরের সমাজপতি ও রাজনৈতিক নেতৃত্বসাধে অত্যাবশ্যক হয় ক্ষিতীশের স্পীচ-রাইটিং ও পরামর্শ—ক্ষিতীশেরও তাকে প্রয়োজন তার স্ত্রী লীলার কারণে এবং সর্বাধিক কোনির সার্থকতায়। এ-ছবিতে তাই বিভিন্ন শিবির এবং শক্তিসমাবেশ ঘটেছে এক বিশাল জীবনচত্বরের পটভূমিকায়—জুপিটারের ধীরেন আর অ্যাপোলোর নকুল তথা বিনোদ ভড় বনাম বিষ্টুধর এবং সর্বাংশে সহধর্মিণী লীলার সঙ্গে ক্ষিতীশের বিষম-সুষম সহাবস্থান সবটাই উঠে এসেছে বৃহত্তর মহত্তর প্রয়োজন-সাধনের সম্পৃক্তিতে—সমাপনী সাফল্যের তৃপ্তি কুড়োতে কোনি তাই তার 'ক্ষিদ্দা'সহ এ-পর্যন্ত যে শ্রম-সহিষ্ণুতা-যন্ত্রণা-দাবদাহের দুঃসহ দুর্বহ পরীক্ষান্তরগুলি ক্রমপর্যায়ে অতিক্রম করেছে, তা এতই চেখে চেয়ে দেখার, মন ঢেলে বোঝার বিষয়। শিক্ষক-শিক্ষার্থীর পারস্পরিক বোঝাপোড়ায় যন্ত্রণাকে জীবন এবং জীবনকে যন্ত্রণায় সমন্বয়িত করে সঠিক তালে-মানে-মাত্রায় উত্তরণই এ-ছবির 'উজ্জ্বল উদ্ধার'।

মতি নন্দীর মূল গল্পকে চিত্র-নাট্যকার-পরিচালক সরোজ দে বহুলাংশে বিশ্বস্ত অনুসরণ করেছেন—অনেকটা সাবলীল সাফল্যও এসেছে সেই সূত্রে। তবে গল্পের হুবহু অনুসরণ চলচ্চিত্রীর সাজে না—ছবির চিত্রদৃশ্য-ধর্মিতার মাধ্যমগত স্বতন্ত্র প্রয়োজনে বরং কিছু-কিছু উন্নতির নমুনা আমরা দেখতে চাই। এ ছবিতেও তার নিদর্শন পাই। পরিস্থিতি এবং ঘটনাগত চরিত্রের পরিবর্তিত-রূপান্তরিত উপস্থাপনে। যেমন, আপোসবিমুখ আদর্শবাদী ঋজু শিরদাঁড়ার সাঁতার-প্রশিক্ষক ক্ষিতীশ যখন অন্যসহায়শূন্য প্রশিক্ষণের স্বার্থে স্বাধীন অর্থোপার্জনের প্রয়োজনে উদীয়মান সমাজনেতা বিষ্টু ধরের কাছে তার স্পীচ-রাইটারের কাজে নিযুক্ত, গল্পে তখন তার একটি অতিগুরুত্বপূর্ণ রচনাকে বিষ্টু ধরের ভাষণরূপে চিহ্নিত করা আছে—পক্ষান্তরে ছবিতে সেটি এক পুরস্কার-বিতরণী অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথির ভাষণরূপে ক্ষিতীশের নিজেরই ঘোষণা বলে চিত্রিত—সুচিত্রণ নিঃসন্দেহ, কেননা এই ভাষণের কটি কথায় ক্ষিতীশেরই চরিত্র এবং আদর্শ স্বপ্রকাশ। যথা : 'একটা সুইমারকে খেটে যন্ত্রণায় ছটফট করতে-করতে উঠতে হয়—বড়ো সাঁতারু জীবনের এবং প্রাণের প্রতীক—সে সারা পৃথিবীকেই প্রেরণা দেয়' অথবা 'ইথিওপিয়া ছোট্ট দেশ, গরিব দেশ, অখ্যাত দেশ। কিন্তু বিকিলা দৌড়ল, দেশটা বিখ্যাত হয়ে গেল।' ইত্যাদি একমাত্র তারই উচ্চারণযোগ্য, তাতে তার আদর্শ আর উদ্দেশ্যগত মাপ আর মান সংগত একটি আয়তন পায়, তার আকর্ষণীয় আবেদন বেড়ে যায়। ছবিতে তাই ঘটেছে। আবার কোনির প্রতি উচ্চারিত তার মন্ত্রের মতো উদ্দীপনা-সঞ্চারী 'ফাইট-কোনি-

ফাইট' কথা-কটি ছবিতে যেভাবে অমোঘ করে ব্যবহৃত আর সুপ্রযুক্ত, তুঙ্গস্পর্শী পরিস্থিতির সংগতিবিচারে, মূল গল্পে তার অভাব ছিল। সেখানে কোনির প্রতি এই মোক্ষম অস্ত্রটির বহু আগেই অপপ্রয়োগ ঘটেছিল। একাগ্নীর ব্যবহার কি যত্রতত্র কর্তব্য? চিত্রনাট্যকার-পরিচালক ছবিতে সেই অব্যর্থতার সঠিক নিশানাই করেছেন। আরেকটি চমৎকার মৌলিক কাজ তাঁর: কোনিকে নিয়ে ক্ষিতীশের চিড়িয়াখানা দর্শন-ভ্রমণের সিংহ-হিংস্র অভিজ্ঞতাকে তার পরবর্তী এক শক্তিসহিষ্ণুতা-পরীক্ষার ক্ষেত্রে সফল-প্রয়োগে প্রদর্শিত। শব্দশ্রুতিরও সুসমন্বয় ঘটেছে একত্রে। এক মেঘবৃষ্টির দিনে কোনির সাঁতার-ক্ষমতা-দক্ষতাকে দমে আর উদ্যমে প্রচণ্ড প্রবল করে তুলতে ক্ষিতীশ সচেষ্ট, হিয়া-অমিয়ার অপমান-প্রসঙ্গ তুলে তাকে উচ্চকিত-উৎসাহিত করছে—তুমুল বিক্রমে হঠাৎ কোনি বিস্ফোরিত হল—সঙ্গে এসে মিলল সিংহের গর্জন ও বিদ্যুৎগতি এবং মেঘের সিংহনাদ: সবটাই তখন কোনির মধ্যে তীব্র আকারে সঞ্চারিত। সচেতন দর্শকের মনে এটি স্থায়ী ছাপ রেখে যায়। পরিচালকের হাতে আরেক উন্নত রূপান্তরের নমুনা: মাদ্রাজগামী ট্রেনে ক্ষিতীশের চেকারকে টিকেট দেখাতে না-পারার গোলমেলে মুহূর্তটি।—সেখানে আমাদের কি মনে হয় যে, ক্ষিতীশ বিনা টিকেটের যাত্রী? মতি নন্দী তাঁর গল্পে তাই লিখেছিলেন, কেন জানি না। আদর্শবাদী ঋজুমনের চরিত্রবান মানুষটিকে বরং পরিচালক সরোজ দে তার ভ্যাবাচ্যাকা ব্যবহারে দিশেহারা আর অসহায় করে দেখিয়ে একটু রহস্যাবরণেই ক্রমে আড়ালে নিয়ে যান—কোনির সঙ্গে তার তুঙ্গসাফল্যবিজয়ী মুহূর্তের পুনর্মিলনে তাদের ছবিতে-দেখানো শেষ সাক্ষাৎ আর সম্ভবত শ্রেষ্ঠ সম্ভাষণ চরম ও পরম ক'রে তুলতেই। ইতিমধ্যে ক্ষিতীশের অনুপস্থিতিতে কোনির মতো দর্শকরাও পরিণাম-নিরাশ হয়ে শূন্যতাবোধ করেন, কষ্ট পান, তাকে নিয়ে গোটা মাদ্রাজপর্বের দুর্ভাগ্যজনকতা এবং অপমান-পীড়ন নাটকীয়তার সঙ্গে ক্ষিতীশ-কেন্দ্রিক ওই আকস্মিক অঘটনের অনিশ্চয়তায় এসে মেশে—তার, তাদের আরেক সাংঘাতিক পরীক্ষা, কঠিন ও ক্রূরতম 'অমানুষিক' পরিহাস ঘনিয়ে ওঠে কোনিকে ঘিরে—মেনে নিতে যেন অগত্যা বাধ্য হই—সেই অপমান-নির্যাতনের যাবতীয় টানাপোড়েন, সংশয়, সংকট, উদ্বেগ অবশেষে ঘটনাক্রমে কোনির সাঁতারে যোগদানের সুযোগে বাঙলার পক্ষে রিলে রেসে চতুর্থ প্রতিযোগী হিসেবে অবতীর্ণ হওয়ার চরমে এসে পৌঁছয়। উৎকণ্ঠায় কাঁটা হয়ে অপেক্ষাতুর সবাই; কদিনের না-কাটা দাড়িতে পাণ্ডুর শীর্ণ 'ক্ষিদ্দা'ও তখন গ্যালারির ধারে আবেগে-ব্যাকুলতায় উপনীত—কোনি তাকে একপলক দেখার অবকাশে বেশ বিচলিত। তবু এবং তাই সে ঝাঁপ দেয় দৃঢ়সংকল্পে, এবং অকুতোভয় সিংহবিক্রমে সে মহারাষ্ট্রের রমা যোশীকে পরাস্ত করে জাতীয় এবং ব্যক্তিগত গৌরবের প্রতিষ্ঠায় সোনা-বিজয়ী হয়, সঙ্গে এত দিনের সমস্ত উপেক্ষা-অবহেলা আর নিপীড়নের যোগ্যতম জবাব দেয় জলে, তার আর ক্ষিদ্দার একান্ত নিজস্ব এলাকায়। সেই চূড়ান্ত সাফল্যবিজয়ের অভিনন্দন-ঘন ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত আনন্দমুহূর্তেও সে বিষাদপ্রতিমার ভঙ্গিতে আশেপাশের সবকিছুকে গৌণ আর নগণ্য করে দিয়ে তার আত্মীয়তম পরমবান্ধব ক্ষিদ্দার দিকে একাগ্রচিত্তে এগিয়ে যায়। সেই তার আন্তরিকতায়, অভিমানে, আবেগে-ব্যাকুলতায় আলোড়িত আর আপ্লুত প্রস্থান-আর আর অবস্থান-মুহূর্তটি গভীর অবিনিবেশ এবং দক্ষতম মুনসিয়ানায় পরিচালক চলচ্চিত্রিত করেছেন। তখনকার সেই সংযতসংহত ঘনক্ষণটুকু চিরস্মরণীয় হয়ে থাকে এই প্রয়োগ-নৈপুণ্যে আর মাত্রারক্ষিত সংলাপে: তার ক্ষিদ্দাকে কোনি তখন বলে—"কোথায় লুকিয়ে ছিলে তুমি?" / "কোথায় ছিলুম জানিস? ওইখানে—ওই জলের ধারে লুকিয়ে ছিলুম আর বলছিলুম—সব পারে, মানুষ সব পারে—ফাইট, কোনি, ফাইট।" "কিছু দেখি নি, কিছু শুনি নি। যন্ত্রণায় আমি মরে যাচ্ছিলুম।" ইত্যাদি।

বস্তুতপক্ষে মানুষের এই সব-পারার কঠিন যন্ত্রণা আর সাধনাসিদ্ধির সঠিক ঠিকানা-নিশানাপূর্ণ চিত্রকাহিনীই কোনি: তাতে সে যেমন, তেমনি তার ক্ষিদ্দা আদ্যন্ত আলোড়িত। সঙ্গে-সঙ্গে মনে পড়ে যায় আবার: রমা যোশীকে তার হারিজিতি ক'রে একটু-একটু ক'রে অবশেষে তার সবটা সমর্পণ করে হঠাৎ জলে উঠে বিজয়-মুহূর্তকে করায়ত্ত করার দারুণ দীপ্ত মুহূর্তটি—ক্যামেরার অভূতপূর্ব সক্ষমতায় আর দক্ষতায় সেটি অবিস্মরণীয় করে ধরা হয়েছে—তার উত্তুঙ্গ সাফল্যের সেই শীর্ষছোঁয়া উদ্বেল অবস্থানটি ফ্রিজ শটে স্থায়িত্ব দেওয়ায় এত দিনের পুঞ্জীভূত সব গ্লানি, খেদ আর ক্রোধের যেন অবাধ অগাধ মুক্তিতে কোনি ক্ষণকালের জয়স্তম্ভিত বিশ্রামে পৌঁছে যায়। সেই উদাত্ত-উন্মাদ বিজয়জনিত উল্লম্ফন তার জীবনের তখন পর্যন্ত সবসেরা উপার্জন—পরবর্তী পুঁজি এবং চিরপাথেয়। পরিচালক তাকে যথোচিত মর্যাদায় ভূষিত করতে একটুও কার্পণ্য করেন নি। তাঁকে ধন্যবাদ। বিশেষত এজন্য যে, ঠিক সেই গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তে কোনি-ক্ষিদ্দার পুনর্মিলন—সম্মিলন তখন থরথর করে আশু সম্ভাবনায় আর প্রত্যাশায় কম্পমান। অবশেষে কোনির ক্ষিদ্দা কোনিকে গঙ্গায় এনে ছেড়ে দেয়, যেন আরো-দূরের দুরন্ততর সাঁতারে—গঙ্গা থেকে আমবারুণী স্নানের দিন সেই যে অশিক্ষিতপটু কোনিকে তুলে নিয়েছিল দীঘিতে, তারপর তার চরম দীঘিসন্তরণসাফল্যের সুশিক্ষিত দক্ষতা-সক্ষমতায় আজ সে তারই হাতে সমর্পিত হল গঙ্গায় তথা আরো দূর-দুর্গম যাত্রায়, অভিযানে। লঙ শটে দেওয়া এই দৃশ্যপরিকল্পনার গভীর ভাবনা দর্শকের মর্মস্পর্শ করে।

এখন দুটি আপত্তির কথা জানাই। আশৈশব দারিদ্র্যপীড়িত অশন-বসনবঞ্চিত কোনির এ-পর্যন্ত জীবনের একটা বড়ো পর্বই কেটে যেতে পারে বাড়িতে কাচা একটি বিবর্ণম্লান ফ্রক পরে—তাই বলে মাদ্রাজগমনকালেও তার কি নতুন জামা জুটতে পারে না? বিশেষত ক্ষিতীশ আর লীলাবতী তখন তার দায়দায়িত্ব সবই বহন করছে—আর লীলা তো তার হিয়াকে হারানো উপলক্ষে তাকে তখন একটি নতুন ফ্রকের প্রতিশ্রুতিবদ্ধ! কোথায় গেল সেই ফ্রক? কোনির দাদা কমলের বাবা-মা-ভাইবোনের পূর্বকাহিনীবর্ণনায় যে দুটি সাজানো মৃত্যুঘটনার স্টিল ব্যবহৃত হয়েছে—ফ্ল্যাশব্যাকে—তার কোনো অত্যাবশ্যকতা এই ছবির পক্ষে ছিল কিনা সন্দেহ। সাদাসরল ন্যারেশনেই সবটা ঢুকতে পারত। পরিচালকের কাঁচি এখানে সংযম দেখায় নি।

অভিনয়ক্ষেত্রে শ্রীপর্ণা সর্বোত্তম নিঃসন্দেহ এবং সৌমিত্র—তবে দ্বিতীয় জন বিষ্টু ধর আর লীলাবতীর সঙ্গে কয়েকটি ছদ্মছলনার শটে মুখচোখের আঙ্গিক অভিনয়ের অতিব্যবহার করেছেন, যা ভাবাতিরেকী। নইলে দুজনেই নিজেদের নিঙড়ে দিয়েছেন। বিষ্টু আর লীলার যথাক্রমে কমিক্যাল ধীরগম্ভীর ভূমিকাভিনয় এত স্বাভাবিক, স্বতঃস্ফূর্ত, যথামাত্রিক যে অবাক লাগে। অন্যান্য অভিনয়ও সঠিক মানের, যথাযথ। আলোকচিত্রী-শব্দযন্ত্রী-সম্পাদকরা যথেষ্ট প্রশংসনীয় কাজ করেছেন। সর্বোপরি চিত্রনাট্যকার-পরিচালক।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রযোজনায় 'চোখ'-'দখল'-'গৃহযুদ্ধ' প্রভৃতির পর তাহলে আরেকটি প্রকৃত সৎ চলচ্চিত্র, সরাসরি প্রাণে এসে লাগার মতো অরাজনৈতিক অথচ কঠিন মনুষ্য-সমস্যা-ভারাক্রান্ত গভীর ছবি পরিবেশিত হল।

নিখিলকুমার নন্দী

স্মরণে

অসীম রায়

আমাদের চেনা কালের মনস্বী লেখক অসীম রায়ের মৃত্যু হল ৩ এপ্রিল ১৯৮৬ তারিখে কলকাতায় ৫৯ বছর বয়সে। বরিশাল জেলার ভোলায় (এখন বাংলাদেশে) ১৯২৭-এর ১৫ মারচে তাঁর জন্ম। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরেজির এম. এ. (১৯৪৮) অসীম রায় তাঁর কর্মজীবন শুরু করেন 'স্টেটসম্যান' পত্রিকার রিপোর্টার হিসেবে। তাঁর মধ্যে এমন একটা অস্থিরতা ছিল যা তাঁকে বারবার কর্মক্ষেত্র এবং জীবনের প্রত্যয় বদলাতে প্ররোচিত করেছিল। ১৯৫১-তে 'স্টেটসম্যান' ছেড়ে গিয়েছিলেন। 'অমৃতবাজার পত্রিকা' ও 'টাইমস অভ ইনডিয়ায়' বেশ কয়েক বছর কাজ করে ছেড়ে দিলেন। এ সময়ে লেখালেখি শুরু করেন। উপন্যাসের জগতে চলে আসেন ১৯৫৩-তে। অবশ্য অল্প বয়স থেকেই কবিতা লেখা শুরু করেন। 'নবমল্লিকা' (১৯৪৩), 'ফুটপাতে ফুলের গল্প' (১৯৫০), 'আমি হাঁটছি' (১৯৭১)—তিনখানি কাব্যগ্রন্থ তিনি প্রকাশ করেন। ১৯৭৪-এ স্টেটসম্যান-এ 'স্পেশাল রেপ্রেজেনটেটিভ' হয়ে ফিরে আসেন। মৃত্যুকাল পর্যন্ত এ পদেই ছিলেন। বলা যায়, সাংবাদিকতা আর সাহিত্যচর্চা, তিরিশ বছর যাবৎ দুটো ক্ষেত্রেই অসীম রায় ছিলেন এবং মুদ্রিত করে গেছেন আপন স্বাক্ষর। তিনি লিখেছেন বেশ-কিছু-সংখ্যক ছোটো গল্প। সম্প্রতি মুদ্রিত হয়েছে দু-খণ্ড ছোটো গল্প। আরো লিখেছেন একটি নাটিকা ('তিন লেনিন'), বাঙলা ও ইংরেজিতে প্রবন্ধ। স্টেটসম্যানের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক কখনোই ছিন্ন হয় নি। পঁয়তিরিশ বছর যাবৎ লিখেছেন নানা রাজনৈতিক ও সামাজিক সমস্যা ও আন্দোলন সম্পর্কে। এর মধ্য দিয়ে অসীম রায় নিজেকে তৈরি করে নিয়েছিলেন এক প্রখর মনস্বী সমাজতত্ত্ববিদ্ ভাষ্যকাররূপে। ইংরেজি ভাষায় সাংবাদিকতা তাঁকে দিয়েছিল প্রখর সমাজসচেতনতা ও ভাষাসচেতনতা। কৈশোর-যৌবনের কাব্যচর্চা দিয়েছিল জীবনের গভীরে যাবার ছাড়পত্র। আর রাজনৈতিক প্রত্যয় দিয়েছিল দেশকাল মানবজীবন

সম্পর্কে গভীর অনুরাগ। সাংবাদিকের অভিজ্ঞতা আর পর্যবেক্ষণ সমৃদ্ধ করেছিল তাঁর গল্প-উপন্যাসকে। তিনি যোগ দিয়েছিলেন কমিউনিস্ট পার্টিতে, পরে পার্টি থেকে বেরিয়ে আসেন।

ব্যক্তিজীবনে অসীম রায় ছিলেন মৃদুভাষী নিরহংকার ভদ্রলোক। স্পষ্ট মনে পড়ে, আমি তখন ত্রিপুরায় স্বেচ্ছা নির্বাসনে। আগরতলা সারকিট হাউসে সন্ধ্যাবেলায় ঢুকছি। সস্ত্রীক অসীম রায় বেরিয়ে আসছেন। এমন অপ্রত্যাশিত জায়গায় তাঁর সঙ্গে দেখা হয়ে যাবে তা ভাবি নি। সেদিন (১৯৮০) তিনি ত্রিপুরা গিয়েছিলেন সংবাদ-সংগ্রহে, পর্যবেক্ষণে আর বিচারে। কিছুদিন পরেই ভারতের অগ্নিকোণের রাজনৈতিক অস্থিরতার নিপুণ পর্যবেক্ষণ করেছিলেন সংবাদপত্রে। সারকিট হাউসের কেয়ারটেকার বক্সুয়া একটি চরিত্র। লক্ষ করলাম অসীম রায় তাঁর সঙ্গে খুব জমিয়ে গল্প করছেন। নিজেকে জাহির না করে বিচিত্র মানুষের সঙ্গে তাঁর মেশার ক্ষমতা সেদিন দেখেছিলাম। এই গুণটি তাঁর গল্প-উপন্যাসে অনায়াস-লক্ষণীয়।

কলকাতায় মাঝে-মাঝে পথেঘাটে দেখা হয়েছে। হাজরা পার্কের পুবে 'কাফে' থেকে খাবার কিনে নিয়ে যেতে দেখেছি। দেখা হলেই শত ব্যস্ততা সত্ত্বেও এক দণ্ড গল্প করতেন।

কিছুকাল পূর্বে তাঁর সঙ্গে দেখা হয়েছিল। তখন সদ্য মারা গেছেন তাঁর পত্নী। শুধলাম চিকিৎসা ঠিক-মতো হয়েছিল কিনা। তাঁর চোখে জল এসে গিয়েছিল। মৃদুকণ্ঠে বললেন, চিকিৎসার কোনো সুযোগই পাওয়া গেল না। অসীম রায়ের মৃত্যু ঘটল সম্প্রতি। শুনলাম নার্সিং হোমে ছিলেন মাত্র পাঁচদিন। এমনি এক দুরারোগ্য ব্যাধি, যার কোনো চিকিৎসা হল না। চলে গেলেন অসীম রায়।

অসীম রায়ের উপন্যাসের সংখ্যা নয়: একালের কথা (১৯৫৩), গোপালদেব (১৯৫৩), দ্বিতীয় জন্ম (১৯৫৭), রক্তের হাওয়া (১৯৬২), দেশদ্রোহী (১৯৬৭), শব্দের খাঁচায় (১৯৬৮), অসংলগ্ন কাব্য (১৯৭৩), একদা ট্রেনে (১৯৭৬) আবহমান-কাল (১৯৭৮)। স্বীকার্য, উপন্যাসলেখকরূপে প্রথম আবির্ভাবে অসীম রায় আমাদের চমকে দিয়েছিলেন। একালের কথা আর গোপালদেব—এ দুটি উপন্যাসের বক্তব্যে যে প্রখর সমাজসচেতনতা। মনস্বিতা আর দৃষ্টিভঙ্গির মৌলিকতা, তা ভোলবার নয়। অধুনা বাঙলা উপন্যাসে যে বক্তব্যহীনতা, অসার সপ্রতিভতা এবং হিংসা-যৌন-সর্বস্বতা দেখা যায়, অসীম রায়ের উপন্যাস তা থেকে মুক্ত। নির্দিষ্ট বক্তব্য এবং প্রখর সমাজসচেতনতা ছাড়া উপন্যাস লেখা উচিত নয়—একথা তিনি সর্বথা মান্য করতেন। দেশবিভাগের আগে-কার পরেকার বাঙালি মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়কে তিনি ঘনিষ্ঠভাবে দেখে-ছেন, বিশ্লেষণ করেছেন। উপন্যাসে রয়েছে তার নির্ভুল পরিচয়।

তাঁর ছোটো গল্প 'শ্রেণীশত্রু', 'শরৎচন্দ্র বাজিতপুর', 'ঝাড়পোঁছ', 'ভারতবর্ষ', 'আরম্ভের রাত', 'সল-বেলো বাড়িওয়ালা বাঙলাদেশ'-এও পাই এই নিবিড় পর্যবেক্ষণ আর তীক্ষ্ণ বিশ্লেষণ। নকশাল আন্দোলনের ঘূর্ণা-বর্তে জড়িয়ে-পড়া তরুণ ('ওনি') বা পশ্চিমবঙ্গে প্রথম অ-কংগ্রেসি সরকার প্রতিষ্ঠা ('আরম্ভের রাত') নিয়ে লেখা কাহিনীর মধ্যে সাংবাদিকের অভিজ্ঞতা যেমন সক্রিয়, তেমনি সক্রিয় তীক্ষ্ণ জীবনবোধযুক্ত সাহিত্যিকের বিশ্লেষণ। তাঁর একটি উপন্যাসের নাম—'শব্দের খাঁচায়'। এই নাম ইঙ্গিত দেয় তিনি কত শব্দসচেতন, পরিবেশসচেতন, বাস্তবসচেতন। তা থেকেই আমরা উপনীত হই অসীম রায়ের নিজস্ব উপলব্ধির জগতে।

অসীম রায়ের শেষ (আমার বিচারে শ্রেষ্ঠ) উপন্যাস—'আবহমান-কাল'। এটি কেবল আয়তনে বড়ো নয়, কালসীমার দিক থেকেও ব্যাপক, জীবনপর্যবেক্ষণেও বড়ো।

অসীম রায় সমকালসচেতন ঔপন্যাসিক। তার শ্রেষ্ঠ পরিচয়স্থল এই উপন্যাস। এই সচেতনতার স্বরূপ কী? কিছু কিছু খণ্ডচিন্নবিক্ষিপ্ত ঘটনার সমাহার আর বিবরণ সমকাল-সচেতনতা নয়। আমাদের চেনাকাল সম্পর্কে লেখকের নিজস্ব নৈতিক উপলব্ধি-ই সমকালসচেতনতা। এটি সব লেখকের থাকে না; অসীম রায়ের ছিল। তিনি জানতেন সমকাল-সচেতনতা বলতে বোঝায়:

'Awareness of the contem-porary situation is not quite the same awareness of the present..... By the novelist's awareness of the contemporary situation, we mean the novel-ist's sense of the age in which he lives, his intuitive feeling for the stresses and pressures that make it what it is and distinguishes it from other times'. (Walter Allen: 'The Novel of Today').

আট পর্বে সমাপ্ত দীর্ঘ উপন্যাস 'আবহমানকাল'। তিরিশ বছর (১৯৩৫-৬৫) ব্যাপী একটি পারিবারিক উত্থানপতনের ফ্রেমে ধরা হয়েছে সারা ভারতের কাহিনী। এস ডি ও ভবনাথ চৌধুরী রানাঘাট থেকে বদলি হয়ে ঢাকা মুনসীগঞ্জে কাজে যোগ দিতে যাচ্ছেন—চূর্ণীর কূল থেকে ধলেশ্বরী-তীরে। শান্তিপ্রিয় আত্মমুখী ভবনাথের সঙ্গে আছে সংসারস্নেহশঙ্কাতুরা স্ত্রী স্বর্ণসুন্দরী, ছোটো মেয়ে বুড়ি, দুই ছোটো ছেলে চোঙা আর টুটুল। বিলেতে পড়ছে বড়ো ছেলে প্রভাগ। বিয়ে হয়ে গেছে বড়ো মেয়ে হেনার, কলকাতায় পড়ে মেজো মেয়ে গৌরী। ছয় ছেলেমেয়ে আর স্ত্রীকে নিয়ে ভবনাথের তিরিশ বছরের সংসার-যাত্রার কাহিনী মারফত লেখক তিরিশ বছরের ঘটনাপ্রবাহে ভাস্যমান সদা-চঞ্চল ভারতবর্ষের জীবনযাত্রাকে রূপ দিয়েছেন। তাৎক্ষণিক সংবাদসুধার স্থূল ক্ষুন্নিবৃত্তি নয়, বাণিজ্যিক সাফল্য-মুখী চতুরতা নয়, রিরংসা-যৌন-সম্ভোগের সমর্থন নয়; অন্য ধরনে লেখক জীবনকে দেখতে চেয়েছেন। ভবনাথের ছোটো ছেলে টুটুল ওরফে অনিন্দ্যর বড়ো হয়ে ওঠা আর অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের মাধ্যমে এবং ভবনাথের আত্মমুখী জীবনবোধের মাধ্যমে লেখক জীবনকে দেখিয়েছেন।

আসলে, এই দেখা আর দেখানোটাই উপন্যাসের সার। 'আবহমানকাল'-এর লেখকের শিল্পানু-ভূতিতে তা ধরা পড়েছে।

তৃতীয় পর্বের শেষে মুনসিগঞ্জ থেকে বদলি হয়ে জলপাইগুড়ির পালা শেষ করে ভবনাথ যখন শেষবারের মতো কলকাতায় বদলি হয়ে যাচ্ছেন, তখনই (১৯৩৯) ভবনাথ উপলব্ধি করেন কালের আবহমানতা। জীবনের এক নির্দিষ্ট ছক তাঁর মতে অপরিহার্য। এই ছকে যেমন উদ্দীপনার স্থান নেই, তেমনি প্রয়োজন নেই দ্রান্তির। কেবল মৃদু হাসি, অনুত্তেজক কণ্ঠ এবং এক কবোষ্ণ কৌতূহল নিয়ে এই উত্তপ্ত কোলাহলপূর্ণ জীবনের সামনে দাঁড়ানো ছাড়া মানুষের আর কী করণীয়? ভবনাথের এই জীবনবোধ তাঁরই অর্জিত।

শান্ত প্রবীণ ভবনাথ রাইটারস বিলডিঙ থেকে বিদায় নেবার (৭ জুন ১৯৪২) পাঁচ বছর দু মাসের মধ্যে দেশ স্বাধীন হল, বিভক্ত হল। ভবনাথের ছোটো ছেলে টুটুল বড়ো হয়ে উঠল। এই বড়ো হয়ে ওঠার কাহিনী এ উপন্যাসে প্রাধান্য পেয়েছে। দেশ-কাল-পরিবেশ-সমাজ কত বদ-লেছে তার পরিচায়ক টুটুল। পথের পাঁচালীর (১৯২৯) অপুর বড়ো হওয়া আর টুটুলের বড়ো হয়ে ওঠার মধ্যে ফারাক আশমান-জমিন।

টুটুলের বড়ো হয়ে ওঠার শেষ পর্ব পনেরো বছরে (১৯৫০-৬৫) ছড়ানো। তার আত্মজিজ্ঞাসা গভীর, আত্মবিশ্লেষণ তীক্ষ্ণ। টুটুল ছাত্র-রাজনীতি থেকে পৌঁছে যায় বৃহত্তর রাজনীতিতে, কিষাণ আন্দোলনের শরিক হয়। ঘুরে বেড়ায় সারা পশ্চিম-বঙ্গ। টুটুলের রাজনীতির জগতের বাইরে আর-এক জগৎ—শিল্প-সাহিত্যের জগৎ তাকে টানে। কৈশো-রের স্বপ্ন থেকে যৌবনের বাস্তবতায় তার উত্তরণ বিশ্বস্তভাবে ধরেছেন লেখক।

টুটুলের বেড়ে-ওঠা আর তীক্ষ্ণ আত্মজিজ্ঞাসা বর্তমান নিবন্ধকারের কাছে খুব কাছের জিনিস মনে হয়। তার কারণ সে টুটুলের সমবয়সী। বস্তুত টুটুল যেসব অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে এগিয়ে চলে তা তার অজানা নয়। ছেলেবেলায় দেখা পদ্মা-ধলেশ্বরীর কূলছাপানো যৌবন নেই কলকাতার গঙ্গায়। তবু এই নিঃশব্দ প্রবাহিণীর ধারে বসতেই বাল্য আর যৌবনের যে প্রবল ছেদ আর অনবচ্ছেদ তা একই সঙ্গে টুটুলের মনে আসে। আর সেই সঙ্গে তার সম-বয়সীরা টুটুলের অভিজ্ঞতা আর অনু-ভবের অংশীদার হয়ে ওঠে। জীবনে যে ছেদ দেখা যায়, তাকেই বড়ো ভাবলে জীবনযাত্রা বেশ স্পষ্ট ছকে বাঁধা যায়। কিন্তু টুটুলের ক্রমাগত মনে হতে থাকে বোধহয় সেই ছকে তার জীবনটাকে বাঁধা যাবে না।

টুটুলের এই উপলব্ধি এসেছে অভিজ্ঞতার অনেক রক্তাক্ত পথ মাড়িয়ে। একারণেই সে আমাদের কাছে সত্য এবং বিশ্বাস্য হয়ে উঠেছে। বাঙলা উপন্যাসের পাঠকসমাজকে এই চরিত্র উপহার দেবার জন্যে অসীম রায়কে মনে রাখছি। উপন্যাসে মর‍্যাল অ্যাওয়ারনেস-এর উপস্থিতি জরুরি বলে তিনি মনে করতেন। এ-কারণে অসীম রায়কে মনে রাখব।

অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়

মতামত

জাতীয় শিক্ষানীতি প্রসঙ্গে

১

ভারত সরকারের প্রস্তাবিত জাতীয় শিক্ষানীতি প্রচারিত হয়েছে 'চ্যালেনজ অব এডুকেশন—এ পলিসি পারসপেকটিভ' পুস্তিকাটিতে। পুস্তিকাটির পৃষ্ঠাসংখ্যা ৬৮। বিষয়বস্তু চারটি অধ্যায়ে বিন্যস্ত। প্রথম অধ্যায়ে আলোচিত শিক্ষার সঙ্গে সমাজের সম্পর্ক; দ্বিতীয় অধ্যায়ে এতদিন পর্যন্ত শিক্ষার অগ্রগতি কতটা হয়েছে তার বিবরণ; তৃতীয় অধ্যায়ে চলতি শিক্ষাব্যবস্থার সম্যক আলোচনা (তার ত্রুটি-বিচ্যুতি, অসম্পূর্ণতা); চতুর্থ অধ্যায়ে তারই প্রেক্ষিতে বলা হয়েছে প্রস্তাবিত শিক্ষানীতি প্রবর্তনের প্রয়োজনীয়তার কথা। পুস্তিকাটি পড়তে-পড়তে বারবার মনে হয়েছে, চলতি শিক্ষাব্যবস্থার অসম্পূর্ণতা সম্পর্কে জনসাধারণ এতদিন ধরে যা বলে এসেছেন বর্তমান সরকার তা-ই যেন স্বীকার করে নিয়ে, সবকিছু বেশ খতিয়ে দেখেশুনে, ভেবেচিন্তে প্রস্তাবিত শিক্ষানীতির কথা বলেছেন। এইভাবে নয়া শিক্ষানীতির অনুকূলে মনস্তাত্ত্বিক সমর্থনের পরিবেশ তৈরি করে নেওয়া হল। পুস্তিকাটির বিষয়বস্তু, উপস্থাপনকৌশল আর ভাষা-ভঙ্গির এখানেই বাহাদুরি।

চতুর্থ অধ্যায়ের শুরুতেই সরকার দাবি করেছেন, স্বাধীনতার পর থেকে জাতীয় আয়ের একটা বিরাট অংশ শিক্ষাখাতে ব্যায় করেছেন। সেই অংশটা কত তা বলা হয় নি। আমাদের জানা আছে, জাতীয় আয়ের তিন শতাংশ শিক্ষাখাতে বায় করা হয়েছে। ভারতবর্ষের মতো উপমহাদেশে, নিরক্ষরতার-ভারে-নুয়েপড়া বিশাল জনসংখ্যার তুলনায়, যেখানে বেশির-ভাগ মানুষ দারিদ্র্য-সীমার নীচে বসবাস করেন, সেখানে এই বায় যে কিছুই নয়—তা বুঝতে কারো অসুবিধা হওয়ার কথা নয়। জনসাধারণের পক্ষ থেকে বারবার বায় বাড়ানোর দাবি করা হয়েছে। যের কমিশন মোট জাতীয় আয়ের দশ শতাংশ শিক্ষাখাতে খরচ করার সুপারিশ করেছিলেন। সরকার তাতে কান দেন নি। সরকার স্বীকার করেন, আর্থিক সংকট শিক্ষার প্রসার এবং উন্নয়নের পক্ষে সবচেয়ে বড়ো অন্তরায়। শিক্ষার প্রসার এবং উন্নয়নে সরকারের যে সামান্য আর্থিক দায়-দায়িত্ব ছিল, বর্তমান প্রস্তাবে তাও অংশত ঘাড় থেকে ঝেড়ে ফেলতে চাইছেন। যে-কোনো দেশের স্বাধীন সরকারের নৈতিক দায়িত্ব হল শিক্ষার ব্যয়ভার বহন করা। স্বাধীনতার পরে সরকার শিক্ষাকে অবৈতনিক এবং সার্বজনীন করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ছিলেন। এখন চাইছেন সেই অঙ্গীকার থেকে মুক্তি।

২

সরকার এইবার শিক্ষাব্যবস্থাকে দুটো ভাগে ভাগ করে ফেলতে চান। একটা হল সাধারণ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, অন্যটা সরকারপরিচালিত অভিজাত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান। প্রথমটির আর্থিক দায়-দায়িত্ব সম্পূর্ণ বহন করবেন জনসাধারণ। এর জন্য যে অঞ্চলে স্কুল খোলা হবে সেই অঞ্চলের বাসিন্দাদের উপর নানা ধরনের কর বসানো হবে, ব্যক্তিগত অনুদান নেওয়া হবে, পড়ুয়াদের বেতন বাড়ানো হবে, অনুদাতাদের অনুদানের টাকা আয়কর থেকে বাদ দেওয়া হবে। সরকারি তহবিল থেকে এক পয়সাও দেওয়া হবে না। দ্বিতীয়টির জন্য সরকার জেলায় জেলায় মডেল স্কুল খুলবেন। এর যাবতীয় আর্থিক দায়-দায়িত্ব কেন্দ্রীয় এবং রাজ্য সরকারের।

সরকার বলছেন—স্কুল-স্তরে পড়াশোনা ছেড়ে দেওয়ার প্রধান কারণ হল দারিদ্র্য। তাই যদি হয়, তাহলে পড়ুয়াদের বেতন বাড়াবার সুপারিশ করেন কেন? কেন বলেন অতিরিক্ত কর, লেভি বসাবার কথা? সরকারি কথা আর কাজের এই অসংগতি থেকে আমাদের ধারণা হয় যে সরকার শিক্ষাসংকোচনের ব্যবস্থা করতে চান।

মডেল স্কুল চালাবার আর্থিক দায়-দায়িত্ব পুরো সরকারের। টাকাটা আসবে জনসাধারণের প্রত্যক্ষ আর পরোক্ষ কর থেকে। ওদিকে আবার সাধারণ স্কুল চালাবার জন্যও জনসাধারণকে দিতে হবে অতিরিক্ত সারচার্জ, লেভি—এ-ও এক তুঘলকি ব্যবস্থা।

সাধারণ স্কুল চালাবার জন্য বড়ো-বড়ো ব্যবসায়ী, কলকারখানার মালিকদের কাছ থেকে অনুদান নেওয়ার সুপারিশ করেছেন সরকার। এইসব অনুদাতারা স্কুল পরিচালনার দায়িত্বে থাকবেন বলে প্রস্তাব করা হয়েছে। এর ফলে দেখা যাবে, গ্রামাঞ্চলে টাকার জোরে শিক্ষার সঙ্গে যাদের কোনো যোগ নেই, তারা স্কুল কমিটিতে জাঁকিয়ে বসেছে।

মডেল স্কুলগুলো সম্পর্কে সরকারি ভাষ্যে শুনতে পাচ্ছি—এইসব স্কুলগুলির দ্বারা, বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলের মেধাবী ছেলেমেয়েরা, উচ্চমানের শিক্ষা লাভ করতে পারবে—তাদের পিতামাতার আর্থিক ব্যবস্থা যাই হোক না কেন। 'উচ্চমানের শিক্ষা' কথাটা লক্ষণীয়। একথা বলে সরকার পরোক্ষে স্বীকার করে নিলেন—সাধারণ স্কুল আর মডেল স্কুলের পাঠ্য বিষয় এবং মানের মধ্যে তফাত থাকবে। তাই যদি হয়, তাহলে এমনতর শিক্ষা-ব্যবস্থায় দুই শ্রেণীর নাগরিক সৃষ্টি হবে। আর এদের মানসিক ব্যবধান হয়ে পড়বে অসেতুসম্ভব। লোক-সাধারণকে ন্যূনতম শিক্ষায় শিক্ষিত করার আর্থিক দায়িত্ব সরকারকে নিতে হবে। তা না করে প্রস্তাবিত শিক্ষানীতি কার্যকর করলে সাধারণ ছেলেমেয়ের সামনে উচ্চশিক্ষার দরজা প্রকারান্তরে বন্ধ করে দেওয়া হবে। অবশ্য এই সরকার যে এটাই চান, তা পরিষ্কার হয়ে যায় সরকারি ভাষ্যে—উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে, বিশেষত আনডার-গ্র্যাজুয়েট স্তরে, সমস্যাটা সুযোগলাভ আর সমতার নয়। এক্ষেত্রে সমস্যা হল বহু সম্পদের অপচয় রোধ করা; এমন বহুসংখ্যক ছাত্র তৈরি করা যাদের কাজে লাগানো যাবে না। অর্থাৎ শিক্ষিত বেকার যাতে তৈরি না হয়, নতুন নতুন চাকরি সৃষ্টির জন্য সরকারের উপর চাপ না আসে, সেজন্য নেওয়া হল শিক্ষা-সংকোচননীতি।

৩

প্রস্তাবিত শিক্ষানীতিতে মাধ্যমিক স্তর থেকে বৃত্তিশিক্ষার উপর জোর দেওয়া হয়েছে। তাতে কৃষি, ব্যাবসা-বাণিজ্য, গার্হস্থ্যবিজ্ঞান, স্বাস্থ্যবিদ্যার কথা বলা হয়েছে ঠিকই, কিন্তু বেশি জোর দেওয়া হয়েছে প্রযুক্তিবিদ্যার ওপর। আমাদের জানা আছে, এর আগে শিল্পবিকাশের স্বার্থে জুনিয়র পলিটেকনিক, পলিটেকনিক, আই. আই. টি খোলা হয়েছে। সেখান থেকে কারিগরি শিক্ষায় দক্ষ হয়ে বেরিয়েও হাজার হাজার ছেলে বেকার বসে আছে। এর কারণ হল: শিল্পপতিরা মুনাফার লোভে শিল্পে যান্ত্রিকীকরণ কখনো প্রসারিত করেন, কখনো বা করেন সংকুচিত। নতুন প্রস্তাবে বলা হয়েছে, দেশের আর্থ-সামাজিক চাহিদার দিক থেকে বৃত্তিশিক্ষার ব্যবস্থা করা হবে, আর সেটাও করা হবে শিল্পপতিদের সঙ্গে পরামর্শ করে। এবং সেই শিক্ষার ব্যবস্থা শিল্পপতিরাই করবেন। তাহলে দেশের প্রযুক্তিবিজ্ঞানের অনগ্রসরতা এবং বেসরকারি শিল্পপতিদের মুনাফার দৃষ্টিকোণ থেকে বৃত্তিশিক্ষার ক্ষেত্রটিকে সংকুচিত করে আনা হল। এমন অবস্থায় বেকারসমস্যা থেকেই যাচ্ছে। বৃত্তিশিক্ষার পরে চাকরি দেওয়ার দায়িত্ব সরকারের নয়। এবং শিল্পপতিদের মুনাফার স্বার্থে শিল্পপ্রসারের যে সম্ভাবনা থেকে যাচ্ছে, তাতে সকলের চাকরির ব্যবস্থা করা অসম্ভব।

৪

এবারে আসা যাক প্রাথমিক শিক্ষার কথায়। সংবিধানের ৪৫ নং অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, সারা দেশের ১৪ বছর বয়স পর্যন্ত সব ছেলেমেয়েকে অবৈতনিক, বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা দিতে সরকার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। কিন্তু বাস্তবে দেখা যাচ্ছে, স্বাধীনতার ৩৮ বছর পরেও শতকরা ৭০ জন প্রাথমিক শিক্ষা পায় নি। কেন এই বেহাল অবস্থা?' এর দুটি কারণ আছে—এক: শিক্ষাখাতে ব্যয়সংকোচ। ১৯৮২-৮৩ সালে শিক্ষাখাতে দেওয়া হয়েছে ১·৩%, ১৯৮৩-৮৪ সালে তা কেটে করা হল ০·৯%। এই অবস্থায় সরকারি পরিসংখ্যান হল—২১৩৭টি প্রাথমিক স্কুলে শিক্ষক নেই, ১৬৯৪৩১টি স্কুলে একজন শিক্ষক প্রথম শ্রেণী থেকে চতুর্থ শ্রেণী পর্যন্ত পড়ান, ১২,৯৪৫১টি স্কুলে আছেন দুজন শিক্ষক। চরম দারিদ্র্য শিক্ষার পক্ষে অন্তরায়। গরিব অভিভাবক দেখেন—পড়তে পাঠিয়ে কোনো লাভ নেই, তার চেয়ে ছেলে-মেয়েদের কাজে ঢুকিয়ে দিলে কিছুটা আর্থিক সুবিধে হয়। অতএব যে বয়সে ছেলেমেয়েদের পড়বার কথা, হুটোপুটি করে বেড়াবার কথা, সেই সময় তারা খেত-খামারে, চায়ের দোকানে, লোকের বাড়িতে কাজ করছে। প্রাথমিক শিক্ষা শেষ হওয়ার আগে ৫০% ছেলেমেয়ে স্কুল ছেড়ে চলে যায়। সরকারি প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, পঞ্চাশের দশকে উচ্চশিক্ষার্থী ছিলেন ১২·৪%, আর সত্তরের দশকে তা নেমে এসেছে ৩·৮%এ।

৫

এবার শিক্ষাক্ষেত্রে রাজনীতির অনুপ্রবেশের কথা। প্রকৃত রাজনীতি মানুষকে উদার করে, সহিষ্ণু করে, একটি আদর্শবোধে স্থিত রেখে চরিত্র তৈরি করে। আজকের রাজনীতিতে এসবের বালাই নেই। রাজনীতি আজ আদর্শভ্রষ্ট, মস্তান-নিয়ন্ত্রিত বলেই শিক্ষাজগৎও তার বাইরে নয়। সেখানেও পড়েছে তার গভীর প্রভাব। রাজনীতির এই চরিত্র না পালটে ছাত্র-শিক্ষকের রাজনীতি বন্ধ করবার কথা বলা আর মাথায় ব্যথা হলে মাথা কেটে ফেলবার প্রেসক্রিপশন করা একই কথা। কেন্দ্রীয় সরকার আইন করে ছাত্র-শিক্ষকের রাজনীতি করবার গণতান্ত্রিক অধিকার হরণ করতে ব্যস্ত, আবার অন্যদিকে বিধানসভার নির্বাচনে টিকিট দিয়েছেন যতসব কুখ্যাত ডাকাত, গুণ্ডা আর মাফিয়া নেতাদের। এখানে প্রাক্তন নির্বাচন কমিশনার আর. কে. ত্রিবেদীর মন্তব্য মনে পড়ে। গত লোকসভা নির্বাচনের সময় তিনি বলেছিলেন, অতীতে রাজনৈতিক দলগুলো গুণ্ডা-বদমাশ-সমাজবিরোধীদের মদতে নির্বাচনে জিতেছে। যাঁরা রাজনীতিতে মাফিয়াদের মদত দিয়ে খুনোখুনির রাজনীতি আমদানি করছেন, খোদ রাজনীতিতে ছাত্র ইউনিয়নের নির্বাচনে গুণ্ডা-মাফিয়াদের ব্যবহার করছেন তাঁরাই আজ সেই রাজনীতির দোষ চাপিয়ে দিচ্ছেন ছাত্র-শিক্ষকদের ঘাড়ে।

৬

সরকার বলছেন, আধুনিক উৎপাদনপদ্ধতিতে যে জটিল প্রযুক্তিবিজ্ঞানের ব্যবহার করা হচ্ছে তার উপযোগী দক্ষ কর্মী তৈরি করা হল শিক্ষার লক্ষ্য। সেইজন্য তাঁরা চান জ্ঞানসাহিত্য ও রসসাহিত্যের চর্চার প্রসার বন্ধ করতে। সরকারি প্রস্তাবে বলা হয়েছে, নতুন ধরনের কর্মভিত্তিক সামাজিক তাৎপর্যপূর্ণ কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় খোলা হবে। অথচ এতে যে শিক্ষার পূর্ণতা আসতে পারে না, তা বলাই বাহুল্য। "সাহিত্যানুশীলনে আমাদের পূর্ণ মনুষ্যত্ব অলক্ষিতভাবে গঠিত হয়—" বলেছেন রবীন্দ্রনাথ। একই কথা শুনতে পাই প্রমথ চৌধুরীর মুখেও। কেবল দক্ষ কারিগর তৈরিতে শিক্ষার পূর্ণতা আসতে পারে না। অথচ সরকার এই মানবিক দিক অস্বীকার করে রোবট তৈরি করতে চান। শিক্ষাকে উৎপাদনমুখী করবার স্লোগান তুলে চলতি বিশ্ববিদ্যালয়-গুলোকে দক্ষ কারিগর তৈরি করবার প্রতিষ্ঠানে রূপান্তরিত করে বিশুদ্ধ জ্ঞানচর্চার পথ বন্ধ করে দেওয়া ঠিক নয়।

সরকার বলেছেন, দেশের অর্থনৈতিক সংকটের জন্য শিক্ষার প্রসার এবং উন্নয়ন মার খাচ্ছে। অথচ আমাদের দেশের বেশির-ভাগ লোক রয়ে গেছে দারিদ্র্যসীমার নীচে। তাহলে দরকার একদিকে জাতীয় আয় বাড়ানো, অন্যদিকে রোজগারের পথগুলো খুলে দিয়ে দারিদ্র্য দূর করা। তা করতে হলে আমাদের দেশের অর্থনৈতিক কাঠামোর আমূল পরিবর্তন দরকার। এবং তার জন্য অবশ্যই চাই পরিচ্ছন্ন প্রশাসন। দলমতনির্বিশেষে শিক্ষাবিদ আর বুদ্ধিজীবীদের শিক্ষাসম্পর্কিত পরামর্শের জন্য সরকার আহ্বান করুন—এই শেষ প্রস্তাব।

বিমলভূষণ চট্টোপাধ্যায়
কোচবিহার। পশ্চিমবঙ্গ

২

জাতীয় শিক্ষানীতির মতো একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে রচনা যে কী পরিমাণে অসংগতি আর ভুলযুক্তিতে আকীর্ণ হতে পারে, কতখানি একদেশদর্শী হতে পারে, 'চতুরঙ্গে'র ফেব্রুয়ারি ১৯৮৬ সংখ্যায় প্রকাশিত অধ্যাপক সতীন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর প্রবন্ধটি তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। শ্রীচক্রবর্তী সনাতনীদের (বাম ও দক্ষিণ) প্রতি তাঁর সঞ্চিত উষ্মাকে খসড়া প্রস্তাবটির সমর্থনের কাজে স্থূলভাবে ব্যবহার করার চমৎকার উদাহরণ স্থাপন করেছেন। সনাতনী (বাম ও দক্ষিণ, বিশেষভাবে বাম) -আখ্যায়িত এমন একটি বিচিত্র, কাল্পনিক প্রতিপক্ষ দাঁড় করিয়ে তর্কযুদ্ধে প্রবৃত্ত হওয়ার ফলে গোটা প্রবন্ধটিই বিশ্লেষণবিমুক্ত, কলহগন্ধী, 'পাঁচজনের কথা অবশ্যমান্য তবে খুঁটি সরাব না'-গোছের হয়ে গেছে।

প্রথমেই জানাই, প্রস্তাবটিকে নতুন শিক্ষানীতির ঘোষণা না বলে খসড়া বা "একটি প্রেক্ষিত" ইত্যাদি বললেও, কেন্দ্রীয় সরকারের জাতীয় স্তরে আলোচনা ইত্যাদির সদিচ্ছা (?) সহজেই স্পষ্ট হয়ে ওঠে, কেননা এই প্রস্তাবানুযায়ী শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ এবং প্রশাসনিক তৎপরতা ইতিমধ্যেই শুরু করে দেওয়া হয়েছে। দলিলটির বিরুদ্ধে বিভিন্ন স্তরে উৎকণ্ঠা, প্রতিবাদ, আন্দোলন ও 'আবেগরাঙা প্রতিক্রিয়া' ইত্যাদি থেকে লেখক নাকি বুঝতে পেরেছেন, 'দলিলটিতে অনেক সত্য কথা আছে'। সত্যানুসন্ধানের এ-এক অদ্ভুত তত্ত্বই বটে! প্রস্তাবটির মূল সর্বনাশা দিকটিকে আড়াল করার উদ্দেশ্যে 'আমলাতান্ত্রিক তাড়াহুড়া'য় অগোছালোভাবে তৈরি, 'নৈয়ায়িক যুক্তিপরম্পরার অভাব এবং রচনাশৈলীর প্রসন্নতার অভাব' ইত্যাদি বলে শাক দিয়ে মাছ ঢাকার চেষ্টাও সহজেই লক্ষণীয়।

শ্রীচক্রবর্তী ১৯৬৮ সালের কোঠারি কমিশনের জাতীয় শিক্ষানীতির পর থেকে ১৯৮৫ পর্যন্ত—এই সতেরো বছরের বিশ্বপরিবর্তনের পরিপ্রেক্ষিতে একবিংশ শতাব্দীর ''ইনফরমেশন-রিচ' এবং 'টেকনোলজি-ইনটেনসিভ' আসন্ন-পৃথিবীর—'দি ওয়র্ল্ড অব টুমরো'র মূল্যায়নকে দলিলটির অভিনবত্ব বলে দাবি করেছেন। কথাগুলি যত গালভরাই হোক না কেন, এই বাগাড়ম্বরের আড়ালে নাভিশ্বাস-ওঠা বর্তমান সমাজব্যবস্থার শাসন-শোষণের দীর্ঘায়ু কামনা ছাড়া আর কিছুই নেই। সমাজ-বিবর্তনের ঐতিহাসিক ধারাপথে ভারতসহ বিশ্বব্যাপী সাম্রাজ্যবাদী ব্যবস্থা আজ আর অতীতের মতো শিক্ষাকে প্রগতির হাতিয়ার বলে মনে করে না; বরং যথার্থ গণতান্ত্রিক শিক্ষা এই মুমূর্ষু শোষণব্যবস্থার উচ্ছেদ করবে, এই আশঙ্কায় যথার্থ শিক্ষার মধ্যে তারা অহরহ মৃত্যুর পদধ্বনি শুনতে পাচ্ছে। কেননা একমাত্র শিক্ষাই সমস্যাকে বুঝতে শেখায়, সমাধানের আলোকবর্তিকা নিয়ে আসে, এবং মানুষকে সত্যাশ্রয়ী ও নৈতিক মূল্যবোধে প্রতিষ্ঠিত করে। তাই তীব্র বাজার-সংকটের কালে উৎপাদনকে ক্রমাগত উন্নততর করার জন্য হাই টেকনোলজি দরকার, শিক্ষা নয়। অথচ এ-কথাটা সোজাসুজি স্বীকার করা যায় না। তাই শিক্ষা আর কৃৎকৌশলকে এক আর অভিন্ন বলে জনমানসকে বিভ্রান্ত করার চক্রান্ত চলেছে। যুগোপযোগী প্রযুক্তিবিদ্যাকে অস্বীকার না করেও যে

শিক্ষার মহান আদর্শকে গ্রহণ করা যেতে পারে, এবং এটি করলেই যে তা 'চিরায়ত, লোকোত্তর (ট্রানসসেনডেনটাল) মানসিকতা'র পরিচায়ক হয় তা অধ্যাপক চক্রবর্তী স্বীকার করেন না, কিংবা বুঝেও অস্বীকার করেন।

প্রবন্ধটিতে স্বাধীনতা-উত্তর ভারতবর্ষের শিক্ষার নানা অব্যবস্থা আর কুফল দেখিয়ে সে তুলনায় পরাধীন ভারতবর্ষের আদর্শ শিক্ষকের জয়গান করা হয়েছে। এ থেকে কি এই বুঝতে হবে যে, স্বাধীন ভারতের শিক্ষানীতির তুলনায় ব্রিটিশ শিক্ষানীতি ভালো ছিল? দ্বিতীয়ত, স্বাধীন ভারতে শিক্ষার ব্যর্থতার দায়ভাগ কি নেহরু পরিবারের সুযোগ্য উত্তরাধিকারী রাজীব সরকারের উপর বর্তায় না? কংগ্রেসের শতবর্ষে ব্রিটিশ-বিরোধী জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের ঐতিহ্যগরিমাকে উত্তরাধিকারের নামে আত্মসাৎ করে রাজনৈতিক মুনাফা লুটতে যাদের একটুকুও বাধে না, স্বাধীন ভারতের ৩৮ বছরের শিক্ষানীতির ব্যর্থতায় তো তাঁদের মাথা হেঁট হয়ে মাটিতে মিশে যাবার কথা। বিভিন্ন সময়ে এই কেন্দ্রীয় সরকারই তো শিক্ষা কমিশন গঠন করেছেন, কমিশনের প্রতিবেদনের উপরে ভিত্তি করে নতুন-নতুন শিক্ষানীতির ঘোষণা করেছেন এবং দেশ জুড়ে তা প্রবর্তনও করেছেন। তবে আজ সারাদেশের শিক্ষাব্যবস্থা এমন অস্বাস্থ্যকর হল কেন? আর ঠিক একইভাবে প্রস্তাবিত শিক্ষানীতির কল্যাণে আগামী কুড়ি বছরে শিক্ষাক্ষেত্রের আরও চূড়ান্ত সর্বনাশ ঘটে যাবে না, এমন কথা কে বলতে পারে? আসলে, অধ্যাপক চক্রবর্তী সমস্যার গভীরে প্রবেশ করার সাহসই সঞ্চয় করতে পারেন নি। ঔপনিবেশিক ভারতে শিক্ষকের আদর্শ বা শিক্ষাক্ষেত্রের সাধুতার পিছনে নৈতিক মূল্যবোধের একটা বড়ো ভূমিকা ছিল। স্বাধীন ভারতে তা ক্রমেই অবলুপ্তির পথে, এবং সেটা কেবল শুধু শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানেই নয়, জাতীয় জীবনের সর্বস্তরে। কিন্তু বর্তমান ভারতবর্ষের সাংস্কৃতিক নৈতিক অবক্ষয়, মূল্যবোধের সংকট প্রগতিশীল অধ্যাপক চক্রবর্তী দেখবেন কেমন করে? কেননা তাঁর মতে "মূল্যবোধের সঙ্গে শিক্ষার সম্পর্কের কথা তোলাটা অধুনা প্রতিক্রিয়াশীলতারই অপর নাম।"

প্রবন্ধটিরই অধিকাংশই স্ববিরোধিতাদোষে দুষ্ট। যেমন 'মানুষ গড়াটাই শিক্ষার চরম লক্ষ্য নিশ্চয়ই', কিন্তু গোটা প্রবন্ধে শিক্ষার উদ্দেশ্য বলে যা বর্ণিত হয়েছে তা যন্ত্র-মানুষ গড়ার ফরমুলা, মানুষ গড়ার নয়। আবার যন্ত্র-গণক আর দূরদর্শনী শিক্ষার অতিবড়ো সমর্থক শ্রীচক্রবর্তী একথাও বলেছেন যে প্রাচীন গণমাধ্যম অর্থাৎ "যাত্রা, ব্রতকথা, ছড়া প্রভৃতির মাধ্যমে শিক্ষাকে দেশের সর্বত্র ছড়িয়ে দিতে হবে।" আসলে শিক্ষার মূল সমস্যাটিকে পাশ কাটিয়ে সম্পূর্ণ রাজনৈতিক-উদ্দেশ্য প্রণোদিত এই দলিলটির বিভ্রান্তির ভূত শ্রীচক্রবর্তীর মাথাতেও ভর করেছে। একটু চোখ মেলে দেখলেই তিনি দেখতে পেতেন যে দূরগত শিক্ষা, যন্ত্রগণক সাক্ষরতা, বেতার ও চলচ্চিত্রীয় শিক্ষা, করেসপনডেনস স্কুল-কলেজ ও ওপেন ইউনিভারসিটির শ্লোগানের মধ্য দিয়ে বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকার তাদের শিক্ষাসম্পর্কিত ন্যূনতম দায়িত্বটু এড়ানোর অপকৌশলে মেতেছেন। তাই পাশাপাশি সেলফ-এমপ্লয়মেনটের সপক্ষেও আজ জোর ওকালতি চলছে। "নানা দেশের অভিজ্ঞতা থেকে দেখা গেছে, দূরদর্শনশিক্ষা ভালো ফল দেয়"—এই নানা দেশের অভিজ্ঞতা শ্রীচক্রবর্তী পেলেন কোথা থেকে? গত আট থেকে দশ ফেবরুয়ারি ন্যাশনাল বুক ট্রাস্টের দিল্লীতে সপ্তম বিশ্ববইমেলা উপলক্ষে আয়োজিত আন্তর্জাতিক সেমিনারে ন্যানসি লারিক, চেন বচুই, ফিলিপ অ্যাটেনবরো প্রভৃতি বিশ্বখ্যাত শিক্ষা-বিজ্ঞানীরা শিশু আর ছাত্রদের মধ্যে টেলিভিশনের মারাত্মক কুফলের কথা একবাক্যে বলে গেলেন। প্রাবন্ধিক বিদ্যায়তনে পোসটার-দেওয়াললিখনের অপসংস্কৃতি লক্ষ করেছেন, কিন্তু দূরদর্শনের পরদায় কনট্রাসেপটিভের বিজ্ঞাপন বা নগ্ন নারীদেহের প্রদর্শন কি তাঁর চোখে পড়ে নি? তাই ভোটের রাজনীতিকে নির্বিঘ্ন রাখতে যাঁরা অনায়াসে কোনো এক সম্প্রদায়ের

অসহায় মহিলাদের পারিবারিক আইনের বাঁধনে বেঁধে মধ্যযুগীয় অন্ধতায় নিক্ষেপ করতে বদ্ধপরিকর, তাঁরাই আবার যখন একবিংশ শতাব্দীর আধুনিক টেকনোক্রাট তৈরি করার জন্য অধীর হয়ে পড়েন তখন ঝুলি থেকে বেড়াল বেরিয়ে পড়ে।

অধ্যাপক চক্রবর্তী তাঁর প্রবন্ধটিকে এমনভাবে সাজিয়েছেন, যাতে প্রস্তাবিত শিক্ষানীতির বিরোধিতা করা মানেই যেন প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থার জয়গান গাওয়া! আমরা আমাদের অভিজ্ঞতায় দেখেছি যে, ইতিপূর্বে গৃহীত সরকারি শিক্ষানীতিগুলির সঙ্গে প্রস্তাবিত খসড়াটির কোনো বিরোধাত্মক দ্বন্দ্ব নেই। বরং স্বাধীনতা-উত্তর ভারতবর্ষে এডুকেশন রেসট্রিকশন স্কীম, জব-ওরিয়েনটেড এডুকেশন, সেনট্রালাইজড অ্যানড রেজিমেনটেড এডুকেশন ইত্যাদির নামে যে একের পর এক আঘাত হানা হয়েছে, জাতীয় শিক্ষানীতির প্রস্তাবিত খসড়াটি সেই ধারাবাহিকতারই একটি পরিণত, সুসংহত এবং সামগ্রিক রূপ, যা বর্তমানের সংকটগ্রস্ত শাসন-শোষণব্যবস্থাকে টিঁকিয়ে রাখার অর্থনৈতিক বনিয়াদের পরিপূরক উপরিকাঠামো মাত্র। এই প্রস্তাবের এমন বহু দিক আছে যা ভয়ংকর রকমের অগণতান্ত্রিক, অনৈতিহাসিক, এবং যা আগামী প্রজন্মকে ঘোর তমসার পিচ্ছিল গুহাপথে ঠেলে দিতে উদ্যত। সেইসব দিকগুলিকে বাদ দিয়ে এখানে শুধু প্রাবন্ধিক-উত্থাপিত বিষয়গুলিরই আলোচনা করলুম।

আলোচনার শেষাংশে শ্রীচক্রবর্তী পশ্চিমবঙ্গের বামফ্রনট সরকারের বিরুদ্ধে টিপ্পনী কেটেছেন। উদ্দেশ্য স্পষ্ট: বহুবিধ কারণে বামফ্রনট শাসনের বিরোধী জনমানস যাতে উলটো প্রতিক্রিয়ায় কেন্দ্রীয় সরকারের শিক্ষাদলিলের সমর্থক বনে যায়। অধ্যাপক চক্রবর্তীর জেনে রাখা দরকার যে সনাতনী (বাম ও দক্ষিণ) না হয়েও শুধু সত্যানুসন্ধানের বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গিতে এই সর্বনাশা শিক্ষাপ্রস্তাবের মূল্যায়ন করা সম্ভব এবং সংগঠিত চেতনার আলোকে একে প্রতিরোধ করাও অসম্ভব নয়। যক্ষরাজের স্বর্ণলালসা আকাশচুম্বী হলে নন্দিনী, কিশোর আর বিশুর দলও বসে থাকে না॥

দেবাশিস ঘোষ
জামালপুর, বিহার

জুন ১৯৮৬ সংখ্যার আংশিক সূচি

ইতিহাস : বামপন্থা : ভবিষ্যৎ
সরোজ মুখোপাধ্যায়—বামফ্রনটের চেয়ারম্যান

বিপন্ন মুসলিম নারী
এস. এ. মাসুদ—কলকাতা হাইকোর্টের প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি

রবীন্দ্রনাথের কবিতা—পাঠান্তর
সনজীদা খাতুন—বাংলাদেশের রবীন্দ্র-গবেষণা-চর্চা
আন্দোলনের অন্যতম অগ্রপথিক

গ্রন্থসমালোচনা
অধ্যাপক জয়ন্ত রায়, অধ্যাপক পবিত্র সরকার